আমার বাংলা বই

ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

আমার বাংলা বই

ইবতেদায়ি

পঞ্চম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

আমার বাংলা বই

ইবতেদায়ি

পঞ্চম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রসঙ্গকথা

ইবতেদায়ি স্তর মাদ্রাসা শিক্ষার ভিত্তিভূমি। প্রাথমিক শিক্ষা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী ও পরিকল্পিত না হলে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই দুর্বল হয়ে পড়ে। এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক স্তরের পরিসর বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তর এবং ধর্ম-বর্ণ কিংবা লৈঙ্গিক পরিচয় কোনো শিশুর শিক্ষা গ্রহণের পথে যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, এ বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) একটি সমন্বিত শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষাক্রমে একদিকে শিক্ষাবিজ্ঞান ও উন্নতবিশ্বের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের চিরায়ত শিখন-শেখানো মূল্যবোধকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে অধিকতর জীবনমুখী ও ফলপ্রসূ করার প্রয়াস বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে। বিশ্বায়নের বাস্তবতায় শিশুদের মনোজাগতিক অবস্থাকেও শিক্ষাক্রমে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান-উপকরণ হলো পাঠ্যপুস্তক। এই কথাটি মাথায় রেখে এনসিটিবি প্রাথমিক স্তরসহ প্রতিটি স্তর ও শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সবসময় সচেষ্ট রয়েছে। প্রতিটি পুস্তক রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিশুমনের বিচিত্র কৌতূহল এবং ধারণক্ষমতা সম্পর্কে রাখা হয়েছে সজাগ দৃষ্টি। শিখন-শেখানো কার্যক্রম যেন একমুখী ও ক্লান্তিকর না হয়ে আনন্দের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে, সেদিকটিতে শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, প্রতিটি বই শিশুদের সুষম মনোদৈহিক বিকাশে সহায়ক হবে। একই সাথে তাদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, অভিযোজন সক্ষমতা, দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের পথকেও সুগম করবে।

ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের সময় পূর্ব-শ্রেণির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে। বর্তমান পাঠ্যপুস্তকে চতুর্থ শ্রেণির কিছু পাঠ পুনরায় রাখা হয়েছে। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির পাঁচটি পাঠ্যপুস্তকে তথ্য ও বর্ণনামূলক রচনাগুলোর ধারাবাহিকতা রয়েছে। আশা করা যায়, এই পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ভাষাশিক্ষার ভিত মজবুত হবে এবং তা পরবর্তী শ্রেণির জন্য সহায়ক হবে।

বইটি রচনা, সম্পাদনা ও পরিমার্জনে যেসব বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষক নিবিড়ভাবে কাজ করেছেন তাঁদের বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের প্রতিও যাঁরা অলংকরণের মাধ্যমে বইটিকে শিশুদের জন্যে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সময়-স্বল্পতার কারণে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। সুধিজনের কাছ থেকে যৌক্তিক পরামর্শ ও নির্দেশনা পেলে সেগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেওয়া হবে।

পরিশেষে বইটি যাদের জন্য, সেই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষক নির্দেশনা

ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ভাষা শিখনে সহায়ক বিভিন্ন ধরনের পাঠ সন্নিবেশ করা হয়েছে। এই পাঠ্যপুস্তকে বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক, কল্পনা-নির্ভর ইত্যাদি বৈচিত্র্যময় পাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট ভাষা-পরিমণ্ডল বিবেচনা করে পাঠ নির্বাচন ও উন্নয়ন করা হয়েছে। ভাষা শিখন প্রক্রিয়াকে শিক্ষার্থীদের জীবন-ঘনিষ্ঠ করার জন্য ভাষাসমগ্র পদ্ধতিকে (Whole Language Approach) ভাষা শিখনের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম শ্রেণির এ পর্যায়ে ভাষা শিখনের বিশেষ করে পড়ার ও লেখার দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রয়োজন হয়। এ পাঠ্যপুস্তকে ভাষাকে দক্ষতা হিসেবে শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক শিখন-অনুশীলনী দেওয়া হয়েছে। শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে নিম্নলিখিত শিখন-শেখানো কৌশল ব্যবহার করবেন।

শোনা ও বলা

শ্রেণিকক্ষে শোনা ও বলা সংশ্লিষ্ট শিখন-শেখানো কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করাতে শিক্ষক নিম্নলিখিত কাজগুলো করবেন।

- শ্রেণিকক্ষে সকল শিক্ষার্থী শুনতে পারে এমন শ্রুতিগ্রাহ্য স্বরে, স্পষ্টভাবে ও প্রমিত উচ্চারণে কথা বলবেন;
- শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে শুনতে বলবেন;
- চিন্তার উদ্রেক করে এমন প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন;
- চিন্তা করতে ও পর্যাপ্ত কথা বলতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন;
- আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করাবেন;
- শিক্ষার্থীদের নিজের অভিমত, মতামত প্রকাশের সুযোগ দেবেন;
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করবেন।

পড়া

পঞ্চম শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশিত পর্যায়ে পড়ার দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের যেসব দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন তা হলো–

- শুদ্ধ, স্পষ্ট ও প্রমিত উচ্চারণে পড়া;
- সঠিক উচ্চারণে শব্দ পড়া;
- শব্দের বানান, অর্থ ও বাক্য পড়া;
- ঠিক গতিতে বিরামচিহ্ন মেনে বাক্য পড়া ও অর্থোদ্ধার করা;
- অনুচ্ছেদ পড়ে অর্থোদ্ধার করা;
- পড়া সংশ্লিষ্ট শিখন-অনুশীলনী সম্পন্ন করা;
- যুক্তব্যঞ্জন স্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়া।

শিক্ষক নির্দেশনা

ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ভাষা শিখনে সহায়ক বিভিন্ন ধরনের পাঠ সন্নিবেশ করা হয়েছে। এই পাঠ্যপুস্তকে বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক, কল্পনা-নির্ভর ইত্যাদি বৈচিত্র্যময় পাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট ভাষা-পরিমণ্ডল বিবেচনা করে পাঠ নির্বাচন ও উন্নয়ন করা হয়েছে। ভাষা শিখন প্রক্রিয়াকে শিক্ষার্থীদের জীবন-ঘনিষ্ঠ করার জন্য ভাষাসমগ্র পদ্ধতিকে (Whole Language Approach) ভাষা শিখনের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম শ্রেণির এ পর্যায়ে ভাষা শিখনের বিশেষ করে পড়ার ও লেখার দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রয়োজন হয়। এ পাঠ্যপুস্তকে ভাষাকে দক্ষতা হিসেবে শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক শিখন-অনুশীলনী দেওয়া হয়েছে। শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে নিম্নলিখিত শিখন-শেখানো কৌশল ব্যবহার করবেন।

শোনা ও বলা

শ্রেণিকক্ষে শোনা ও বলা সংশ্লিষ্ট শিখন-শেখানো কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করাতে শিক্ষক নিম্নলিখিত কাজগুলো করবেন।

- শ্রেণিকক্ষে সকল শিক্ষার্থী শুনতে পারে এমন শ্রুতিগ্রাহ্য স্বরে, স্পষ্টভাবে ও প্রমিত উচ্চারণে কথা বলবেন;
- শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে শুনতে বলবেন;
- চিন্তার উদ্রেক করে এমন প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন;
- চিন্তা করতে ও পর্যাপ্ত কথা বলতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন;
- আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করাবেন;
- শিক্ষার্থীদের নিজের অভিমত, মতামত প্রকাশের সুযোগ দেবেন;
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করবেন।

পড়া

পঞ্চম শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশিত পর্যায়ে পড়ার দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের যেসব দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন তা হলো–

- শুদ্ধ, স্পষ্ট ও প্রমিত উচ্চারণে পড়া;
- সঠিক উচ্চারণে শব্দ পড়া;
- শব্দের বানান, অর্থ ও বাক্য পড়া;
- ঠিক গতিতে বিরামচিহ্ন মেনে বাক্য পড়া ও অর্থোদ্ধার করা;
- অনুচ্ছেদ পড়ে অর্থোদ্ধার করা;
- পড়া সংশ্লিষ্ট শিখন-অনুশীলনী সম্পন্ন করা;
- যুক্তব্যঞ্জন স্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়া।

১. নির্ধারিত পাঠের অর্থ উদ্ধারের পর্যায়

এ পর্যায়ে পাঠ পরিচালনার জন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে নিম্নোক্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারেন:

- প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে পাঠ শুরু করা;
- পাঠ-সংশ্লিষ্ট ছবি বিশ্লেষণ করা;
- সম্ভাব্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা আলোচনা করা;
- পাঠের শিরোনাম পড়তে বলা;
- পাঠের বিষয়বস্তুর সঙ্গে পাঠের শিরোনামের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মতামত জানতে চাওয়া;
- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে শুদ্ধ, স্পষ্ট ও প্রমিত উচ্চারণে নির্ধারিত পাঠ পড়া;
- শিক্ষার্থীদের পড়তে দেওয়া ও পঠিত অংশের অর্থ অনুধাবন করার সুযোগ প্রদান;
- পাঠের নির্ধারিত অংশের মূল শব্দ চিহ্নিত করতে বলা ও সংশ্লিষ্ট বাক্য সরবে পড়তে বলা;
- প্রশ্ন করতে ও মতামত প্রদানে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা।

২. ভাষা-শিখন সহায়ক কর্মকাণ্ড পরিচালনা পর্যায়

এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জন্য ভাষা-শিখন সহায়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড শিক্ষক পরিচালনা করবেন। পাঠের শিখনফলের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন শিখন-কর্মকাণ্ডের (learning activities) মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভাষা-দক্ষতা অর্জনে শিক্ষক সহায়তা করবেন। ভাষা-শিখন সহায়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড হচ্ছে—

- নতুন শব্দের অর্থ আলোচনা ও বাক্য পর্যায়ে তা প্রয়োগ;
- যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণ ও যুক্তবর্ণ যোগে শব্দ গঠন;
- পাঠ প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন-উত্তর বলা ও লেখা;
- বিপরীত শব্দ জানা ও বাক্য পর্যায়ে তা প্রয়োগ;
- জোড় শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি;
- বিরামচিহ্ন হিসেবে দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক সম্পর্কে জানা ও বাক্যে তা ব্যবহার;
- কথোপকথনভিত্তিক বাক্য বলা ও লেখা;
- ছবি দেখে বাক্য বলা ও লেখা;
- নির্ধারিত বিষয়বস্তু যেমন- নদী, ঋতু, প্রিয় প্রাণী ইত্যাদি সম্পর্কে একাধিক বাক্য লেখা;
- পাঠ্যপুস্তকের বাইরে সমমানের গল্প, কবিতা বলা;
- নিজের ভাষায় পঠিত বিষয়বস্তু বলা ইত্যাদি।

উল্লিখিত শিখন-কর্মকাণ্ডে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করাবেন। প্রতিটি শিখন কর্মকাণ্ডে-শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত চর্চার সুযোগ প্রদান করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শিক্ষক নির্ধারিত পাঠের সাথে এ পর্যায়ে শিখন-কর্মকাণ্ডসমূহ শ্রেণিকক্ষে যথাযথভাবে পরিচালনা করবেন। শব্দের অর্থ আলোচনার সময় শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা জানা, জীবন-ঘনিষ্ঠ উদাহরণের মাধ্যমে শিক্ষক অর্থ আলোচনা করবেন। যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শব্দে নির্ধারিত যুক্তবর্ণ দেখিয়ে তারপর শিক্ষক সংশ্লিষ্ট বর্ণ ভেঙে দেখাবেন। নির্ধারিত যুক্তবর্ণ যোগে একাধিক শব্দ উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের থেকে নির্ধারিত যুক্তবর্ণ যোগে শব্দ সম্পর্কে শিক্ষক জানতে চাইবেন। নতুন শব্দ ও যুক্তবর্ণ শিখন-শেখানোর জন্য শিক্ষক দেয়ালে অর্থসহ নতুন শব্দ

এবং বিশ্লেষণসহ যুক্তবর্ণের তালিকা দেয়ালে টানিয়ে রাখতে পারেন। নতুন শব্দ ও যুক্তবর্ণের দেয়াল-তালিকা শিক্ষার্থীদের শব্দ ও যুক্তবর্ণ শিখনকে সহজ ও কার্যকর করতে সহায়তা করবে। নতুন পাঠের সংশ্লিষ্ট নতুন শব্দ ও যুক্তবর্ণ শিক্ষক নিয়মিত তালিকায় যুক্ত করতে পারেন।

৩. অর্জিত শিখন বাস্তবে প্রয়োগের সক্ষমতা উন্নয়নের পর্যায়

এটি হচ্ছে শিক্ষার্থীর অর্জিত শিখন বাস্তবে প্রয়োগের পর্যায়। এ পর্যায়ে অর্জিত শিখনের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থী নিজের ভাষায় লিখবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী মুক্তভাবে নিজের ভাষায় প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে লিখবে। পাঠের উত্তর লেখার সাথে এ ধরনের লেখার পার্থক্য হলো, এ লেখা শিক্ষার্থীর অর্জিত শিখন ও অভিজ্ঞতা নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে লেখায় নিজের জানা শব্দ ব্যবহারের জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করবেন। শিক্ষার্থীকে পাঠে পড়ানো হয়নি এমন শব্দও যদি শিক্ষার্থী এ ধরনের লেখায় ব্যবহার করে তবে কোনো অসুবিধা নেই। লেখায় সৃজনশীলতার জন্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষক প্রশংসা করবেন। লেখায় বানান ভুল করলে সংশোধনের জন্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষক সুযোগ দেবেন। বানান শুদ্ধ হলে শিক্ষক শিক্ষার্থীর প্রশংসা করবেন।

শিক্ষার্থী যখন নিজের ভাষায় লেখা শেষ করবে শিক্ষক তখন তা সরবে পড়তে বলবেন। শিক্ষার্থীরা পরস্পরের সাথে লেখা বিনিময় করবে এবং একে অপরের লেখা সরবে পড়বে।

ভাষা-শিখনের প্রতিটি পর্যায়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন উদ্দেশ্য গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে প্রত্যাশিত যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, সে জন্য শিখন-কর্মকাণ্ডে শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণ করাবেন। ভাষাদক্ষতা শিখনের ক্ষেত্রে শোনা, বলা, পড়া ও লেখা পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। কাজেই সামগ্রিক ভাষাদক্ষতা অর্জনে সহায়তা করতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রতিটি দক্ষতা অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করবেন। ভাষা শিখন-শেখানো কর্মকাণ্ডগুলি যাতে যৌক্তিক হয়, শিক্ষককে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। শ্রেণিকক্ষের প্রতিটি কর্মকাণ্ড শিক্ষার্থীদের ভাষা শিখনে যাতে সহায়ক হয় শিক্ষক সে ব্যাপারে যত্নবান হবেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থীর মাঝে সংগঠিত সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক কর্মকাণ্ড ভাষা-শিখনকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। কাজেই ভাষা-শিখন-শেখানোর সকল ক্ষেত্রে শিক্ষক মিথস্ক্রিয়ামূলক (interactive) কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবেন যেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার অবাধ সুযোগ থাকবে।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক একটি সক্রিয় শিখন-পরিবেশ এবং শিক্ষার্থীর জীবনঘনিষ্ঠ প্রেক্ষাপটের মধ্য দিয়ে ভাষা-শিখন শিক্ষার্থীদের বাস্তবমুখী ও কার্যকর ভাষাদক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. এই দেশ এই মানুষ	১
২. সংকল্প	৬
৩. সুন্দরবনের প্রাণী	১০
৪. হাতি আর শিয়ালের গল্প	১৬
৫. ফুটবল খেলোয়াড়	২২
৬. বীরের রক্তে স্বাধীন এ দেশ	২৬
৭. সবার আমি ছাত্র	৩১
৮. শখের মৃৎশিল্প	৩৫
৯. শব্দদূষণ	৪২
১০. স্মরণীয় যাঁরা বরণীয় যাঁরা	৪৫
১১. স্বদেশ	৫১
১২. কাঞ্চনমালা আর কাঁকনমালা	৫৭
১৩. অবাক জলপান	৬৫
১৪. ঘাসফুল	৭৪
১৫. আমরা তোমাদের ভুলব না	৭৭
১৬. শিক্ষাগুরুর মর্যাদা	৮২
১৭. ভাবুক ছেলেটি	৮৬
১৮. দুই তীরে	৯২
১৯. বিদায় হজ	৯৬
২০. জলপরী ও কাঠুরের গল্প	১০২
২১. নোলক	১০৬
২২. কুমড়ো ও পাখির কথা	১০৯
২৩. দৈত্য ও জেলে	১১৫
• শব্দের অর্থ জেনে নিই	১২১

এই দেশ এই মানুষ

"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।" কবির এ কথার অর্থ– আমাদের সৌভাগ্য ও সার্থকতা যে আমরা এদেশে জন্মেছি। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ বাংলায় কথা বলে। তবে আমাদের দেশে যেমন রয়েছে প্রকৃতির বৈচিত্র্য, তেমনি রয়েছে মানুষ ও ভাষার বৈচিত্র্য। বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাগুলোতে বসবাস করে বিভিন্ন জাতিসত্তার মানুষ। এদের কেউ চাকমা, কেউ মারমা, কেউ মুরং, কেউ তঞ্চঙ্গ্যা ইত্যাদি। এছাড়া রাজশাহী আর জামালপুরে রয়েছে সাঁওতাল ও রাজবংশীদের বাস। তাদের রয়েছে নিজ নিজ ভাষা। একই দেশ অথচ কত বৈচিত্র্য। এটাই বাংলাদেশের গৌরব। সবাই সবার বন্ধু, আপনজন। এদেশে রয়েছে নানা ধর্মের লোক। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান। সবাই মিলেমিশে আছে যুগ যুগ ধরে।

২০২৫

বাংলাদেশের এই যে মানুষ, তাদের পেশাও কত বিচিত্র। কেউ জেলে, কেউ কুমার, কেউ কৃষক, কেউ শ্রমিক, কেউ আবার কাজ করে অফিস-আদালতে। সবাই আমরা পরস্পরের বন্ধু। একজন তার কাজ দিয়ে আরেকজনকে সাহায্য করে। গড়ে তোলে এই দেশ।

একবার ভাবি কৃষকের কথা। তারা কাজ না করলে আমাদের খাদ্য জোগাত কে? সবাইকে তাই আমাদের শ্রদ্ধা করতে হবে, ভালোবাসতে হবে। সবাই আমাদের আপনজন।

আমাদের আছে নানা ধরনের উৎসব। মুসলমানদের রয়েছে দুটি ঈদ, ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আযহা। হিন্দুদের দুর্গা পূজাসহ আছে নানা উৎসব আর পার্বণ। বৌদ্ধদের আছে বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা। খ্রিষ্টানদের আছে ইস্টার সানডে আর বড় দিন। এছাড়াও রয়েছে নানা উৎসব। পহেলা বৈশাখ নববর্ষের উৎসব। আবার রাখাইনদের সাংগ্রাই ও চাকমাদের বিজু উৎসব রয়েছে। আমরা একে অপরের উৎসবে সহযোগিতা করি।

পার্বত্য জেলার ঘরবাড়ি

আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদও ভিন্ন ভিন্ন ধরনের, ভিন্ন ভিন্ন ধাঁচের। মিল আমাদের একটা জায়গায় – সকলেই আমরা বাংলাদেশের অধিবাসী।

বাংলাদেশের প্রকৃতি ও জনজীবন ভারি বৈচিত্র্যময়। এই দেশকে তাই ঘুরে ঘুরে দেখা দরকার। কোথায় পাহাড়, কোথায় নদী, কোথায়-বা এর সমুদ্রের বেলাভূমি। দেশের নানা প্রান্ত যেমন ঘুরে দেখা দরকার, তেমনি দরকার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের বাড়ি বেড়াতে যাওয়া, পরস্পর মেলামেশা করা, কাছাকাছি আসা, মানুষকে ভালোবাসা।

দেশ মানে এর মানুষ, নদী, আকাশ, প্রান্তর, পাহাড়, সমুদ্র – এইসব। দেশ হলো মায়ের মতো। মা যেমন স্নেহ, মমতা ও ভালোবাসা দিয়ে আমাদের আগলে রাখেন, দেশও তেমনই তার আলো, বাতাস ও সম্পদ দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। এদেশকে আমরা ভালোবাসব।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

সৌভাগ্য প্রকৃতি বৈচিত্র্য বেলাভূমি প্রান্তর স্বজন সার্থক সাংগ্রাই বিজু

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

প্রকৃতি	সৌভাগ্য	বৈচিত্র্য	বেলাভূমি	প্রান্তর	সার্থক

ক. আমাদের .... যে আমরা এদেশে জন্মেছি।

খ. আমাদের দেশে রয়েছে সুন্দর .... ।

গ. কোথায় পাহাড়, কোথায় নদী, কোথায়-বা এর সমুদ্রের .... ।

ঘ. একই দেশ অথচ কত .... ।

ঙ. দেশ মানে এর মানুষ, নদী, আকাশ, ..., পাহাড়, সমুদ্র– এইসব।

চ. দেশকে ভালোবাসার মধ্য দিয়েই .... হয়ে উঠবে আমাদের জীবন।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়া আর কারা বাস করে?
খ. বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মের উৎসবগুলোর নাম কী?
গ. বাংলাদেশের জনজীবনের বৈচিত্র্যসমূহ কী কী?
ঘ. "দেশ হলো মায়ের মতো।"– দেশকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কেন?
ঙ. জেলেদের পেশা কী? তারা যদি কাজ না করে তাহলে আমাদের কী হতে পারে?
চ. আমরা একে অপরের উৎসবে সহযোগিতা করি– এ কথার দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ছ. দেশকে কেন ভালোবাসতে হবে?

৪. নিচের অনুচ্ছেদ অবলম্বনে ৩টি প্রশ্ন তৈরি করি।

দেশ মানে এর মানুষ, নদী, আকাশ, প্রান্তর, পাহাড়, সমুদ্র– এইসব। দেশ হলো মায়ের মতো। মা যেমন আমাদের স্নেহমমতা, ভালোবাসা দিয়ে আগলে রাখেন, দেশও তেমনই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। এ দেশকে আমাদের ভালোবাসতে হবে। দেশকে ভালোবাসার মধ্য দিয়েই সার্থক হয়ে উঠবে আমাদের জীবন।

৫. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। খালি জায়গায় ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

বাঙালি	অবাঙালি

বন্ধু	শত্রু

দেশ	বিদেশ

সার্থকতা	ব্যর্থতা

ক. আমাদের বাংলাদেশের বাইরেও অনেক .... আছে।

খ. আমরা সবাই পরস্পরের................................।

গ. .... হলো মায়ের মতো।

ঘ. আমাদের .... যে আমরা এদেশে জন্মেছি।

৬. নিচের বাক্য কয়টি পড়ি ।

মনির খুব ভালো ছেলে। রবিন তার বন্ধু। মনির ও রবিন একত্রে মাঠে খেলে।

এখানে,

মনির, রবিন – বিশেষ্য পদ

খুব ভালো – বিশেষণ পদ

তার – সর্বনাম পদ

ও – অব্যয় পদ

খেলে – ক্রিয়া পদ

এবার নিচের বাক্য কয়টি থেকে ৫ ধরনের পদ খুঁজে বের করি।

বাংলাদেশের জনজীবন ভারি বৈচিত্র্যময়। এই দেশকে তাই ঘুরে ঘুরে দেখা দরকার। এজন্য দরকার দেশের নানা প্রান্তে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের বাড়ি বেড়াতে যাওয়া। সবাইকে সবার ভালোবাসা উচিত।

৭. কর্ম-অনুশীলন।

ক. বাংলাদেশের যেকোনো উৎসব সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করি।

খ. শিক্ষকের নির্দেশনায় নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে (মাসে একবার)

টেলিভিশন/রেডিও/খবরের কাগজে প্রচারিত সংবাদ দেখে/শুনে/পড়ে নিচের ছক অনুযায়ী আলাদা কাগজে তা লিখে আনি। পরে শ্রেণিকক্ষে পড়ে শোনাই ও অন্যদের লেখা শুনি।

তারিখ	আনন্দের সংবাদ	দুঃখের সংবাদ	খেলার সংবাদ

সংকল্প

কাজী নজরুল ইসলাম

থাকব না কো বদ্ধ ঘরে
দেখব এবার জগৎটাকে,—
কেমন করে ঘুরছে মানুষ
যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
দেশ হতে দেশ দেশান্তরে
ছুটছে তারা কেমন করে,
কিসের নেশায় কেমন করে
মরছে যে বীর লাখে লাখে,
কিসের আশায় করছে তারা
বরণ মরণ-যন্ত্রণাকে ॥

হাউই চড়ে চায় যেতে কে
চন্দ্রলোকের অচিন্‌পুরে;
শুনব আমি, ইঙ্গিত কোন্‌
মঙ্গল হতে আসছে উড়ে ॥
পাতাল ফেড়ে নামব নিচে
উঠব আবার আকাশ ফুঁড়ে;
বিশ্ব-জগৎ দেখব আমি
আপন হাতের মুঠোয় পুরে ॥

(অংশবিশেষ)

অনুশীলনী

১. কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই।

অসীম বিশ্বকে জানার কৌতূহল মানুষের। কিশোরেরও তাই। সে জানতে চায় বিশ্বের সকল কিছুকে। আবিষ্কার করতে চায় অসীম আকাশের সকল অজানা রহস্যকে। সে বুঝতে চায় কেন মানুষ ছুটছে অসীমে, অতলে। বীরেরা কেন জীবনকে অনায়াসে বিপন্ন করে, কেন বরণ করে মৃত্যুকে। সে জানতে চায় দুঃসাহসীরা কেন উড়ছে। তাই কিশোর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, সে আর বদ্ধ ঘরে বসে থাকবে না। পৃথিবীটাকে সেও ঘুরে ঘুরে দেখবে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং বাক্য তৈরি করে বলি ও লিখি।

সংকল্প বদ্ধ যুগান্তর দেশান্তর বরণ মরণ-যন্ত্রণা চন্দ্রলোক
অচিনপুর ফেড়ে

৩. শব্দগুলোর অর্থলিখি ও বাক্য তৈরি করি। একটি করে দেখানো হলো।

সংকল্প – প্রতিজ্ঞা – ভালো কাজের জন্য সবাইকে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করা উচিত।

বন্ধ –

দেশান্তর –

ইঙ্গিত –

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কবি বন্ধ ঘরে থাকতে চান না কেন?

খ. যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে মানুষ ঘুরছে বলতে কী বোঝ লেখ?

গ. চন্দ্রলোকের অচিনপুরে কারা যেতে চায়?

ঘ. কবি হাতের মুঠোয় পুরে কী এবং কেন দেখতে চান?

৫. ক্রিয়াপদের সাধু ও চলিত রূপ শিখি।

চলিত রূপ	সাধু রূপ	চলিত রূপ	সাধু রূপ
আঁকব	আঁকিব	ছুটছে	ছুটিতেছে
দেখব	দেখিব	আসছে	আসিতেছে
ঘুরছে	ঘুরিতেছে	চলছে	চলিতেছে
মরছে	মরিতেছে		

৬. ক্রিয়ার কাল সম্পর্কে জেনে নিই।

ক. আমি কাজটি করি।

আমি কাজটি করেছিলাম।

আমি কাজটি করব।

উপরের বাক্যগুলোতে ব্যবহৃত 'করি', 'করেছিলাম' ও 'করব'–এগুলো 'করা' ক্রিয়াপদটির বিভিন্ন রূপ। যে সময়ে ক্রিয়া বা কাজটি সম্পন্ন হয়, সেই সময়টিকেই ক্রিয়ার কাল বলা হয়। যেমন বর্তমান কাল, অতীত কাল, ভবিষ্যৎ কাল।

খ. নিচের বাক্যের ক্রিয়াবাচক শব্দগুলোর নিচে দাগ দিই।

আমি বড় হয়ে মানুষের জন্য কাজ করতে চাই।

আমি আমার দক্ষতা অন্যের উপকারে ব্যবহার করি।

২০২৫

কামাল বর্ষাকালে তার গ্রামে গাছ লাগাবে।

তরুণ চিকিৎসক হবে। মানুষকে চিকিৎসা সেবা দেবে।

(গ) নিচের ভবিষ্যৎ কালবাচক ক্রিয়াপদগুলোকে বর্তমান ও অতীত কালবাচক ক্রিয়াপদে রূপান্তর করি।

থাকব, দেখব, শুনব, খাব, বেড়াব, ঘুরব, পড়ব, খেলব, চড়ব, নামব, ধরব, হাসব

ভবিষ্যৎ	বর্তমান	অতীত
থাকব	থাকি	থেকেছিলাম
....	....	....
....	....	....
....	....	....

৭. শব্দগুলোর বানান লিখি।

বরণ, মরণ, যন্ত্রণা (র-এর পরে 'ণ' বসে), বন্ধ, যুগান্তর, দেশান্তর, বিশ্বজগৎ, ইঙ্গিত।

৮. কবির সংকল্পগুলো লিখি।

৯. আমার সংকল্পগুলো লিখি।

১০. কবিতাটি আবৃত্তি করি ও মুখস্থ লিখি।

কবি-পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইসলাম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মতারিখ ২৫শে মে, ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দ, (১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সন)। তিনি বিদ্রোহী কবি নামেই বেশি পরিচিত। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি।

তাঁর কবিতা, গান, গল্প, নাটক, উপন্যাস আমাদের সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। শিশুদের জন্য তিনি অনেক গান, কবিতা, ছড়া ও নাটক লিখেছেন। 'অগ্নি-বীণা', 'বিষের বাঁশী', 'ঝিঙে ফুল' তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। তিনি ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট, (১২ই ভাদ্র ১৩৮৩ সন) ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

সুন্দরবনের প্রাণী

বাংলাদেশের দক্ষিণে সমুদ্রের কোল ঘেঁষে গড়ে উঠেছে বিশাল বন। এর নাম সুন্দরবন। এখানে রয়েছে যেমন প্রচুর গাছপালা, তেমনি রয়েছে নানা প্রাণী ও জীবজন্তু।

রয়েল বেঙ্গাল টাইগার

বিশ্বের কোনো কোনো প্রাণীর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে দেশের নাম বা জায়গার নাম। যেমন, ক্যাঙ্গারু বললেই মনে পড়ে যায় অস্ট্রেলিয়ার কথা। সিংহ বললেই চোখে ভেসে ওঠে আফ্রিকার কথা। তেমনি বাংলাদেশের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে রয়েল বেঙ্গাল টাইগার বা রাজকীয় বাঘের নাম। এই বাঘ সুন্দরবনে থাকে। রয়েল বেঙ্গাল টাইগার দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি আবার ভয়ংকর। এর চালচলনও রাজার মতো। সুন্দরবনের ভেজা স্যাঁতসেঁতে গোলপাতার বনে এ বাঘ ঘুরে বেড়ায়।

শিকার করে জীবজন্তু, সুযোগ পেলে মানুষও খায়। একসময় সুন্দরবনে ছিল চিতাবাঘ ও গুলবাঘ। কিন্তু এখন আর এসব বাঘ দেখা যায় না। সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাংলাদেশের অমূল্য সম্পদ। এ বাঘকে বিলুপ্তির হাত থেকে আমাদের বাঁচাতে হবে।

সুন্দরবনে বাঘ ছাড়াও আছে নানা রকমের হরিণ। কোনোটার বড়ো বড়ো শিং, কোনোটার গায়ে ফোঁটা ফোঁটা সাদা দাগ। এদের বলে চিত্রা হরিণ। একসময় সুন্দরবনে প্রচুর গন্ডার ছিল, ছিল হাতি ও বুনো শুয়োর। এখন এসব প্রাণী আর নেই। তবে আমাদের দেশের রাঙামাটি আর বান্দরবানের জঙ্গলে হাতি দেখতে পাওয়া যায়।

যেকোনো দেশের জন্যই জীবজন্তু, পশুপাখি এক অমূল্য সম্পদ। যে দেশে যেমন আবহাওয়া ও জলবায়ু, সে দেশে তেমন উপযোগী প্রাণী বাস করে। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, পৃথিবীতে অপ্রয়োজনীয় প্রাণী বা বৃক্ষলতা বলতে কিছুই নেই। একসময় আমাদের দেশে প্রচুর শকুন দেখা যেত। এরা উড়ে বেড়াত আকাশের অনেক উপর দিয়ে। বাসা করত গাছের ডালে। মানুষের পক্ষে যা ক্ষতিকর, সেইসব আবর্জনা শকুন খেত এবং পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখত। শকুন দেখতে সুন্দর নয়, তবে মানুষের অনেক উপকার করে। কিন্তু শকুন এখন বাংলাদেশে বিলুপ্তপ্রায় পাখি।

প্রাণী, বৃক্ষলতা সব কিছুই প্রকৃতির দান। পশুপাখি ও জীবজন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে। এদের ধ্বংস করতে নেই। ধ্বংস করলে নেমে আসে নানা বিপর্যয়—বন্যা,

চিত্রা হরিণ

২০২৫

গণ্ডার

হাতি

শকুন

মদন টাক

বুনো শুয়োর

খরা, ঝড় ইত্যাদি।

অতীতে সুন্দরবন আরো অনেক বড়ো ছিল। আমরা সুন্দরবনের অনেক ক্ষতি করেছি। ফলে সুন্দরবনের অনেক প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যেসব প্রাণী আছে, তাদের বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে হবে। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস থেকে সুন্দরবন আমাদের রক্ষা করে। তাই সুন্দরবনকেও আমাদের রক্ষা করতে হবে।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

কোল অস্ট্রেলিয়া রয়েল ভয়ংকর অমূল্য বিলুপ্তপ্রায়

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

অমূল্য	অপার	সম্ভার	রয়েল	ভয়ংকর	বিলুপ্তপ্রায়

ক. প্রকৃতির অপার .... সমুদ্রের নিচে রয়েছে।

খ. বাংলাদেশের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে .... বেঙ্গল টাইগার।

গ. বাঘ দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি আবার ....।

ঘ. রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাংলাদেশের .... সম্পদ।

ঙ. শকুন বাংলাদেশে এখন .... পাখি।

৩. প্রাণীগুলো চিনে নিই।

ক্যাঙ্গারু	একমাত্র অস্ট্রেলিয়াতেই পাওয়া যায় এমন একটি প্রাণী। এদের পা চারটি, কিন্তু পেছনের দু-পা বড়ো আর সামনের দু-পা ছোটো। এর ফলে অন্যান্য চতুষ্পদ প্রাণীর মতো এরা হাঁটাচলা করে না, পেছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। ক্যাঙ্গারু তার বুকের নিচে থাকা থলিতে বাচ্চা রাখে।
চিতাবাঘ	এক প্রকার বাঘ। অন্য বাঘের সঙ্গে চিতাবাঘের পার্থক্য হলো চিতাবাঘ তাদের চেয়ে দ্রুত দৌড়াতে ও গাছে উঠতে পারে।
গণ্ডার	কালো ও ধূসর রঙের চতুষ্পদ প্রাণী, উচ্চতা ও লম্বায় গরুর আকারের। এদের নাকের ওপরে শিং থাকে।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. ক্যাঙ্গারু ও সিংহ বললেই কোন কোন দেশের কথা মনে পড়ে?
খ. বিভিন্ন ধরনের বাঘ সম্পর্কে তুমি যা জান লেখ।
গ. দেশের জন্য পশুপাখি, জীবজন্তু কী উপকার করে তা নিজের ভাষায় লেখ।
ঘ. শকুন কীভাবে মানুষের উপকার করে?
ঙ. পশুপাখি জীবজন্তু না থাকলে প্রকৃতির কী বিপর্যয় ঘটবে বলে তোমার মনে হয়?

৫. নিচের বাক্য দুটি পড়ি।

মানুষের পক্ষে যা ক্ষতিকর সেইসব আবর্জনা শকুন খেয়ে ফেলে। সে সত্যিকার অর্থে মানুষের উপকার ছাড়া অপকার করে না।
উপরের বাক্য দুটিতে অনেক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দই এক-একটি পদ :

শকুন .... বিশেষ্য পদ
ক্ষতিকর .... বিশেষণ পদ
সে .... সর্বনাম পদ
খায় .... ক্রিয়া পদ
ছাড়া .... অব্যয় পদ

পদ পাঁচ প্রকার: বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, অব্যয়।

নিচের বাক্যগুলো থেকে বিশেষ্যপদ খুঁজে বের করো।
সুন্দরবনে বাঘ ছাড়াও আছে নানা রকমের হরিণ। কোনোটার বড়ো বড়ো শিং, কোনোটার গায়ে ফোঁটা ফোঁটা সাদা দাগ। এদের বলে চিত্রা হরিণ।

৬. নিচের নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশের যেকোনো একটি প্রাণী সম্পর্কে রচনা লিখি।

ক. আকৃতি –
খ. রং –
গ. কোথায় দেখা যায় –
ঘ. আবাসস্থল –
ঙ. খাদ্যাভ্যাস –

২০২৫

৭. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. ক্যাঙ্গারু বললেই মনে পড়ে যে দেশের কথা–

১. ভারত ২. বাংলাদেশ
৩. অস্ট্রেলিয়া ৪. আফ্রিকা

খ. আফ্রিকার কথা উঠলে কোন প্রাণীর কথা মনে হয়?

১. সিংহ ২. হাতি
৩. বাঘ ৪. উট

গ. বাংলাদেশের কোন জঙ্গলে হাতি দেখতে পাওয়া যায়?

১. সিলেট ও খুলনার ২. ভাওয়াল ও মধুপুরের
৩. রাঙামাটি ও বান্দরবানের ৪. উপরের সবখানে

ঘ. কোন পাখি ক্ষতিকর আবর্জনা খেয়ে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখে?

১. ঈগল ২. শকুন
৩. চিল ৪. কাক

ঙ. কোন প্রাণীর গায়ে ফোঁটা ফোঁটা সাদা দাগ ও বড় শিং আছে?

১. চিতা বাঘ ২. চিত্রা হরিণ
৩. ভালুক ৪. গন্ডার

৮. কর্ম-অনুশীলন।

আমি এমন প্রাণীদের একটি তালিকা তৈরি করি– যাদের নাম শুনেছি, কিন্তু চোখে দেখিনি। পরে শ্রেণির সবার সাথে তা মিলিয়ে দেখি।

হাতি আর শিয়ালের গল্প

সে অনেক অনেক দিন আগের কথা। চারদিকে তখন কী সুন্দর সবুজ বন, ঝোপঝাড়! আর দিগন্তে ঝুঁকে-পড়া নীল আকাশের ছোঁয়া। মানুষ ও প্রাণীরা ছিল খুব শান্তিতে।

মানুষ তখন একটু একটু করে সভ্য হচ্ছে। কী করে সবার সাথে মিলেমিশে থাকা যায়, শিখছে সেইসব কায়দাকানুন। ওদিকে বনে বনে তখন পশুদের রাজত্ব। হাজার রকমের প্রাণী, অসংখ্য পাখ-পাখালি। বেশ শান্তিতেই কাটছিল বনের পাখি আর প্রাণীদের দিনগুলো। কিন্তু একদিন হলো কি, তাড়া খেয়ে মস্ত একটা হাতি ওই বনে ঢুকে পড়ল। হাতিটার সে-কী বিশাল শরীর। পা-গুলো বটপাকুড় গাছের মতো মোটা। শুঁড় এতটাই লম্বা যে, আকাশের গায়ে গিয়ে বুঝি ঠেকবে। তার গায়েও অসীম জোর। এই শরীর আর শক্তি নিয়েই তার যত অহংকার। তাছাড়া মেজাজটাও দারুণ তিরিক্ষি।

যেই-না হাতিটার ঐ বনে ঢোকা, অমনি শুরু হয়ে গেল তোলপাড়। নতুন অতিথি এসেছে, সবাই স্বাগত জানাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু দুষ্টু হাতিটার তখন সে-কী তুলকালাম কাণ্ড! খুব জোরে গলা ফাটিয়ে দিল প্রচণ্ড একটা হুংকার। থরথর করে কেঁপে উঠল সমস্ত বন। গাছে গাছে নিশ্চিন্তে বসেছিল পাখিগুলো, তারা ভয়ে ডানা ঝাপটাতে শুরু করল। মাটির তলায় লুকিয়ে ছিল যে ইঁদুর, গুবরে পোকার দল–তারাও বুঝতে চাইল কী এমন ঘটল যে, এমন করে কেঁপে উঠল পৃথিবী?

হাতিটা এমন ভাব করতে শুরু করল, সেই বুঝি বনের রাজা। গুরুগম্ভীর ভারিক্কি চালের কেশর দোলানো প্রবল শক্তিধর সিংহ। সেও হাতিটার কাছে আসতে ভয় পায়। হালুম বাঘ মামা, সেও হাতিটার ধারে-কাছে ঘেঁষতে চায় না। বনের সবাই ভয়ে তটস্থ, শঙ্কিত। কখন জানি কী হয়!

একবার হাতিটা নিরীহ একটা হরিণকে শুঁড়ে জড়িয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। আরেকবার ছোট্ট একটা খরগোশকে পায়ের তলায় পিষে মেরে ফেলল। সেই থেকে বনের কোনো প্রাণী হাতিটার ছায়াও মাড়াত না। দিনে দিনে হাতিটা হয়ে উঠল আরও অহংকারী। এই নিয়ে বনের কারো মনে শান্তি নেই।

কিন্তু এভাবে কি দিন যায়? এক সন্ধ্যায় বনের সব প্রাণী এসে জড়ো হলো সিংহের গুহায়। এর একটা বিহিত চাই, সবার মুখে এক কথা। বাঘ, ভালুক, সিংহ, বানর, হরিণ, বনবিড়াল, শিয়াল সবাই সলা-পরামর্শ করতে বসল। শেষে সবাই মিলে শিয়ালের উপরেই ভার দিল হাতিকে সামলানোর।

তারপর একদিন শিয়াল ভয়ে ভয়ে হাজির হলো হাতির আস্তানায়। লেজ গুটিয়ে একটা সালাম দিল। বলল, আপনিই তো বনের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণী। আপনিই আমাদের রাজা। ওই দেখুন, নদীর ওপারে সবাই উদগ্রীব হয়ে বসে আছে। তারা আপনাকে রাজা হিসেবে বরণ করে নিতে চায়।

হাতি তো শিয়ালের কথা শুনে মহাখুশি। 'আচ্ছা চল' বলে সে শিয়ালের সাথে হাঁটা শুরু করল।

নদীর পারে এসে শিয়াল বলল, এই আমি নদী সাঁতরে পার হচ্ছি। আপনিও আসুন।

এই বলে শিয়াল নদীতে দিল ঝাঁপ। হাতি ভাবল, পুঁচকে শিয়াল যদি নদী পার হতে পারে, আমি পারব না কেন? সেও নদীতে নেমে পড়ল।

হাতির মস্তবড়ো শরীর। ভীষণ ভারী। হাতিটা নদীর পানিতে যেই পা দিল, অমনি তার ভারী শরীর একটু একটু করে তলিয়ে যেতে থাকল। তলিয়ে যেতে যেতে হাতি বলল, শিয়াল ভায়া, আমাকে বাঁচাও।

শিয়াল ততক্ষণে নদী পার হয়ে তীরে উঠে গেছে।

শিয়াল হাতিকে বলল, তোমাকে বাঁচাব আমরা? এতদিন তোমার অত্যাচারে আমরা কেউ বনে শান্তিতে ঘুমাতে পারিনি। বনের যত প্রাণী ছিল, সবাই শিয়ালের কথার প্রতিধ্বনি করে সমস্বরে বলে উঠল :

ঠিক বলেছ শিয়াল ভায়া
দেখব না আর হাতির ছায়া
আমরা এখন মুক্ত-স্বাধীন
নাচছি সবাই তা-ধিন তা-ধিন।

(হিতোপদেশ অবলম্বনে)

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

দিগন্ত অহংকার তিরিক্ষি তুলকালাম কাণ্ড হুঙ্কার সমস্বরে তটস্থ শঙ্কিত শক্তিধর আস্তানা উদ্‌গ্রীব

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

দিগন্তের	অহংকার	তিরিক্ষি	তুলকালাম কাণ্ড	হুঙ্কার	মেদিনী	তটস্থ	শঙ্কিত

ক. বিদ্যুৎ চমকালে .... কেঁপে ওঠে বলে মনে হতে পারে।

খ. .... পতনের মূল।

গ. কী হয়েছে, এত .... হয়ে আছ কেন?

ঘ. বনের সিংহ .... দিলে মানুষের মনে ভয় জাগে।

ঙ. নিজের কলমটা খুঁজে না পেয়ে সে .... বাঁধিয়ে দিয়েছে।

চ. .... ওপারে কী আছে কেউ জানে না।

ছ. মেজাজ .... বলে তার কাছে কেউ ঘেঁষতে চায় না।

জ. তুমি এত .... কেন? কী হয়েছে?

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. প্রবল শক্তিধর কাকে বলা হয়েছে?
খ. বনের পশুদের ওপর অশান্তি নেমে আসার কারণ কী?
গ. গল্পে মুক্ত-স্বাধীন বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ঘ. শিয়াল হাতিকে শাস্তি না দিলে বনের পশুপাখিদের কী হতো ব্যাখ্যা কর।
ঙ. হাতির এই শাস্তির জন্য তার চরিত্রের কোন বিষয়গুলো দায়ী বলে তুমি মনে কর।
চ. সবাই মিলে শিয়ালকে দায়িত্ব দিল কেন?
ছ. শিয়াল কীভাবে বনের পশুপাখিকে রক্ষা করল?
জ. অহংকারী ও অত্যাচারীর পরিণাম শেষ পর্যন্ত কী হয়?

৪. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। খালি জায়গায় ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

সুন্দর	কুৎসিত

অহংকার	বিনয়

ভয়	সাহস

স্বাধীন	পরাধীন

ক. আমরা .... দেশের অধিবাসী।

খ. .... পতনের মূল।

গ. চেহারা নয়, আসল .... হলো মানুষের মন।

ঘ. মনে .... থাকলে কোনো কিছু করা সম্ভব নয়।

৫. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. বনের সব প্রাণী কার কাছে এসে জড়ো হলো?

১. বাঘ　　২. শিয়াল
৩. হাতি　　৪. সিংহ

খ. কার জন্য বনে আবার শান্তি এলো?

১. সিংহ　　২. শিয়াল
৩. ভালুক　　৪. বাঘ

গ. হাতির অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য কেন শিয়ালকে দায়িত্ব দেয়া হলো?

১. শিয়াল সাঁতার জানে　　২. শিয়াল খুব সাহসী
৩. শিয়াল বুদ্ধিমান　　৪. শিয়াল হাতির বন্ধু

ঘ. হাতির করুণ পরিণতির জন্য দায়ী কোনটি?

১. হাতির অহংকার　　২. হাতির লম্বা শুঁড়
৩. হাতির ভারী শরীর　　৪. হাতির বোকামি

ঙ. হাতিকে বাঁচানোর জন্য কেউ এগিয়ে এলো না কেন?

১. হাতির অত্যাচারের জন্য　　২. হাতি খুব বড় বলে
৩. হাতির ভয়ে　　৪. হাতি সাঁতার জানে বলে

৬. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

শান্তি	অশান্তি	অসৎ প্রতিবেশীর কারণে তার অশান্তি লেগেই আছে।
সভ্য	....	....
ধ্বনি	....	....
শক্তিশালী	....	....

৭. নিচের শব্দগুলোর কোনটি কোন পদ লিখি।

দুষ্টু – বিশেষণ

হাতি –

বুদ্ধিমান –

এবং –

আমি –

চায় –

৮. যেকোনো একটা প্রাণী সম্পর্কে বলি এবং পাঁচটি বাক্যের একটা অনুচ্ছেদ রচনা করি।

৯. কর্ম-অনুশীলন।

একটি গল্প লেখার চেষ্টা করি। প্রথমে ২/৩টি সাদা কাগজ নিই। সেগুলোকে ভাঁজ করে নোটবুকের মতো তৈরি করি। এখন প্রতিটি কাগজের এক পাশে নিচের দিকের অর্ধেক থেকে গল্প লেখা শুরু করি। আর উপরের অর্ধেকে নিজের খুশিমতো ছবি আঁকি। লেখা শেষে উপরে একটা কভার পৃষ্ঠা যোগ করি। সে-পৃষ্ঠায় গল্পের একটা নাম দিই ও লিখি, নিজের নাম লিখি এবং ইচ্ছামতো ছবি আঁকি। এভাবে নিজের লেখা একটি গল্পের বই তৈরি করি।

ফুটবল খেলোয়াড়

জসীমউদ্‌দীন

আমাদের মেসে ইমদাদ হক ফুটবল খেলোয়াড়,
হাতে পায়ে মুখে শত আঘাতের ক্ষতে খ্যাতি লেখা তার।
সন্ধ্যাবেলায় দেখিবে তাহারে পটি বাঁধি পায়ে হাতে,
মালিশ মাখিছে প্রতি গিঁটে গিঁটে কাত হয়ে বিছানাতে।
মেসের চাকর হয় লবেজান সেঁক দিতে ভাঙা হাড়ে,
সারা রাত শুধু ছটফট করে কেঁদে কেঁদে ডাক ছাড়ে।
আমরা তো ভাবি ছ মাসের তরে পঙ্গু সে হলো হায়,
ফুটবল-টিমে বল লয়ে কভু দেখিতে পাব না তায়।

প্রভাত বেলায় খবর লইতে ছুটে যাই তার ঘরে,
বিছানা তাহার শূন্য পড়িয়া ভাঙা খাটিয়ার ’পরে।
টেবিলের পরে ছোট বড় যত মালিশের শিশিগুলি,
উপহাস যেন করিতেছে মোরে ছিপি-পরা দাঁত তুলি।
সন্ধ্যাবেলায় খেলার মাঠেতে চেয়ে দেখি বিস্ময়ে,
মোদের মেসের ইমদাদ হক আগে ছুটে বল লয়ে।

বাম পায়ে বল ড্রিবলিং করে ডান পায়ে মারে ঠেলা,
ভাঙা কয়খানা হাতে পায়ে তার বজ্র করিছে খেলা।
চালাও চালাও আরো আগে যাও বাতাসের আগে ধাও,
মারো জোরে মারো—গোলের ভিতরে বলেরে ছুঁড়িয়া দাও।
গোল-গোল-গোল, চারদিক হতে ওঠে কোলাহলকল,
জীবনের পণ, মরণের পণ, সব বাধা পায়ে দল।
গোল-গোল-গোল— মোদের মেসের ইমদাদ হক কাজি,
ভাঙা দুটি পায়ে জয়ের ভাগ্য লুটিয়া আনিল আজি।
দর্শকদল ফিরিয়া চলেছে মহা-কলরব করে,
ইমদাদ হক খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসে যে মেসের ঘরে।
মেসের চাকর হয়রান হয় পায়েতে মালিশ মাখি,
বেঘুম রাত্র কেটে যায় তার চিৎকার করি ডাকি।
সকালে সকলে দৈনিক খুলি মহা-কলরবে পড়ে,
ইমদাদ হক কাল যা খেলেছে কমই তা নজরে পড়ে।

২০২৫

অনুশীলনী

১. কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই।

ইমদাদ হক একজন ফুটবল খেলোয়াড়। খেলায় জেতাই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। নিজের অবস্থা যেমনই হোক না কেন, খেলা-পাগল সে, খেলবেই। খেলতে গিয়ে ইমদাদ কত শত আঘাত পায়। তবু সেসব কস্টকে পরোয়া না করে সে খেলে এবং তার জন্যই খেলায় জয় আসে। তার জন্যই সকল দর্শক আনন্দ পায়। এই কবিতায় খেলাচ্ছলে একটি আদর্শকে তুলে ধরা হয়েছে। তা হলো, মানুষ যদি মনপ্রাণ দিয়ে কিছু করে, তবে সে বড় কিছু করতে পারে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

ক্ষত পটি মালিশ ড্রিবলিং বজ্র কোলাহলকল মহাকলরব

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

বজ্র	পটি	মালিশের	ক্ষত	মহাকলরব

ক. ইমদাদ হকের শরীরে অনেক আঘাতের .... রয়েছে ।

খ. সন্ধ্যাবেলায় পায়ে হাতে .... বাঁধে সে।

গ. খেলায় জিতে দর্শকেরা .... করে ফিরে যাচ্ছে।

ঘ. টেবিলের ওপর .... শিশিগুলো রাখা আছে।

ঙ. .... পড়ার শব্দে শিশুটির ঘুম ভেঙে গেল।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনে নিই ও লিখি।

ক. সকাল বেলায় ফুটবল খেলোয়াড় ইমদাদ হকের বিছানা শূন্য পড়ে ছিল কেন?

খ. টেবিলের ওপরে ছোট-বড় মালিশের শিশি কবিকে উপহাস করছে কেন?

গ. ইমদাদ হকের খেলা নিয়ে দৈনিক পত্রিকায় কী লেখা হয়েছিল?

৫. খালি জায়গায় কবিতার ঠিক লাইনটি লিখি।

ক. ....,

সারা রাত শুধু ছটফট করে কেঁদে কেঁদে ডাক ছাড়ে।

খ. টেবিলের পরে বড় ছোট যত মালিশের শিশিগুলি,

.... ।

গ. গোল-গোল-গোল— মোদের মেসের ইমদাদ হক কাজি,

.... ।

৬. ইমদাদ হক সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখি।

৭. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

৮. কর্ম-অনুশীলন।

ক. আমার প্রিয় খেলা নিয়ে একটি রচনা লিখি।

খ. ফুটবল খেলা দেখতে যাওয়ার জন্য সাময়িক ছুটি চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট একটা আবেদনপত্র লিখি।

গ. নিচের ফরমটি খাতায়/কাগজে লিখে পূরণ করি।

আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

প্রতিযোগিতা ফরম

১. শিক্ষার্থীর নাম : ....

২. বিদ্যালয়ের নাম :..

৩. শ্রেণি :..

৪. (ক) শিক্ষার্থীর পিতার নাম:..

(খ) শিক্ষার্থীর মাতার নাম:..

৫. বর্তমান ঠিকানা

গ্রাম/সড়ক নম্বর .... ডাকঘর/মহল্লা ....

উপজেলা .... জেলা ....

৬. স্থায়ী ঠিকানা

গ্রাম/সড়ক নম্বর .... ডাকঘর/মহল্লা ....

উপজেলা .... জেলা..

৭. জন্মতারিখ...

৮. যেসব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক

ক. ....

খ. ....

গ. ....

....

শ্রেণিশিক্ষকের স্বাক্ষর   শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

কবি-পরিচিতি

জসীমউদ্‌দীন

কবি জসীমউদ্‌দীন ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মতারিখ ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি।

গ্রামবাংলার প্রকৃতি ও সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন। তাঁর কবিতায় পল্লিজীবন বেশি উঠে এসেছে বলে তিনি 'পল্লিকবি' নামে খ্যাত হয়েছেন। জসীমউদ্‌দীন ছোটোদের জন্যও অনেক সুন্দর কবিতা ও গদ্য রচনা করেছেন। তাঁর লেখা ভ্রমণকাহিনি ও আত্মজীবনী অত্যন্ত সুন্দর। তাঁর কবিতা 'কবর', কাব্যগ্রন্থ 'নক্সী কাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', ছোটোদের জন্য লেখা 'ডালিম কুমার', 'হাসু' ও 'এক পয়সার বাঁশি' বিখ্যাত রচনা। তিনি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই মার্চ ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

বীরের রক্তে স্বাধীন এ দেশ

দুরন্ত এক কিশোর। নাম নূর মোহাম্মদ শেখ। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। নাটক, থিয়েটার আর গানের প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগ। কিশোর বয়সে হঠাৎ করে তাঁর বাবা-মা মারা গেলেন। বদলে গেল তাঁর জীবন। যোগ দিলেন ইপিআর-এ অর্থাৎ ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এ। ১৯৭১ সালে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৭১ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর।
যশোরের ছুটিপুরে পাকিস্তানি সৈন্যদের ক্যাম্প। একটু দূরে গোয়ালহাটি গ্রামে টহল দিচ্ছিলেন পাঁচ মুক্তিযোদ্ধা। এঁদেরই নেতৃত্বে ছিলেন ল্যান্সনায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ। পাকিস্তানি সেনারা টের পেয়ে যায় মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান। তারা তিন দিক থেকে তাঁদের ঘিরে ফেলে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা দমবার পাত্র নন। এই দলেই ছিলেন অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা নান্নু মিয়া। কিন্তু প্রতিপক্ষের একটা গুলি হঠাৎ এসে তাঁর গায়ে লাগে। নূর মোহাম্মদ তাঁকে এক হাত দিয়ে কাঁধে তুলে নিলেন আর অন্য হাত দিয়ে গুলি চালাতে থাকলেন। বারবার নিজের অবস্থান পরিবর্তন করতে থাকলেন যাতে শত্রুরা মনে করে অনেক মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ করছেন। সংখ্যায় কম বলে তিনি সহযোদ্ধাদের নির্দেশ দিলেন পিছিয়ে গিয়ে অবস্থান নিতে।

হঠাৎ মর্টারের একটা গোলা এসে তাঁর পায়ে লাগল। গোলার আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল তাঁর পা। তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর মৃত্যু আসন্ন। সহযোদ্ধাদের জীবন রক্ষার জন্য যতক্ষণ সম্ভব গুলি চালাতে চালাতে তিনি শহিদ হলেন। নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে নূর মোহাম্মদ শেখ
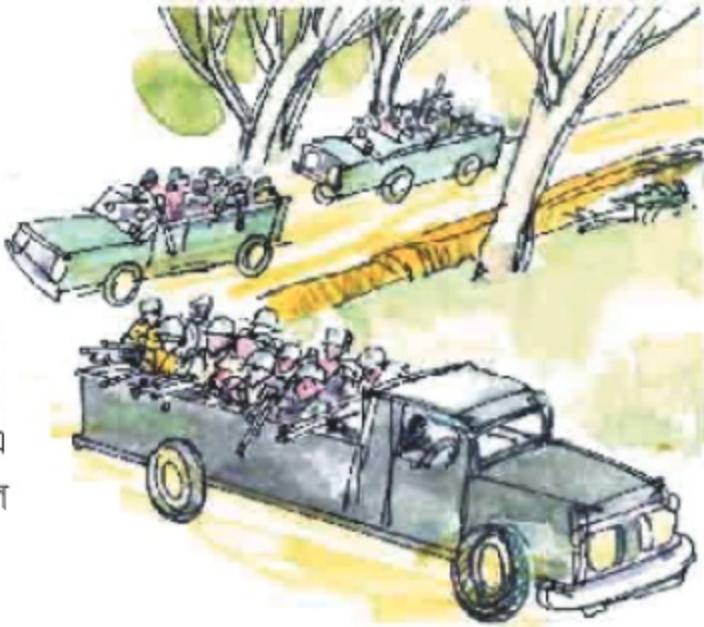
এভাবেই রক্ষা করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন। তাঁর জন্ম ১৯৩৬ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি নড়াইলের মহিষখোলা গ্রামে। তিনি একজন বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা।

বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ

এ রকমই আরেক যোদ্ধা বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্সনায়েক মুন্সী আবদুর রউফ। ১৯৪৩ সালের ৮ই মে ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারি থানার সালামতপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় তিনি খুব দুরন্ত ছিলেন। তিনিও ইপিআর বাহিনীতে যোগ দেন। মেশিন-চালক হিসেবে সুনাম অর্জন করেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন।

দিনটি ছিল একাত্তরের ৮ই এপ্রিল। ঐদিন মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি নৌসেনাদের উপর আক্রমণ করবে। এজন্যে তাঁরা খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ির কাছে বুড়িঘাট এলাকার চিংড়ি খালের দুই পাশে অবস্থান গ্রহণ করেন। পাকিস্তানি সৈন্যরা মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ করতে এগিয়ে আসে। সাথে নিয়ে আসে সাতটি স্পিডবোট আর দুটি মোটর লঞ্চ। স্বল্পসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু অবধারিত হলেও তাঁরা পালিয়ে যাননি। আবদুর রউফ নিজেই দায়িত্ব নিলেন নিজের জীবন দিয়ে সবাইকে রক্ষা করার। মেশিনগান হাতে তুলে নিয়ে গুলি ছুঁড়ে শত্রুদের রুখে দিতে থাকলেন। সহযোদ্ধাদের বললেন নিরাপদে সরে যেতে। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে পাকিস্তানিদের সাতটি স্পিডবোটই ডুবে গেল। বাকি লঞ্চ দুটো থেকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে তারা পিছু হটতে থাকল। এ রকম মুহূর্তেই হঠাৎ একটা গোলা এসে পড়ল তাঁর উপর তিনি শহিদ হলেন। বীরের রক্তস্রোতে রঞ্জিত হলো দেশের মাটি।

বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ

বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ রুহুল আমিন

একাত্তরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কতভাবেই না যুদ্ধ করতে হয়েছিল আমাদের। এই যুদ্ধে জয়ী বাহিনী হিসেবে মুক্তিযোদ্ধারা বয়ে এনেছেন অসীম গৌরব। এরকমই এক যুদ্ধে শহিদ হন বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ রুহুল আমিন।

ডিসেম্বরের ১০ তারিখ। মুক্তিযুদ্ধের শেষ প্রান্তে আমরা। মুক্তিযোদ্ধাদের নৌজাহাজ বিএনএস পলাশ এবং বিএনএস পদ্মা মংলা বন্দর দখল করে নিয়েছে। এবার লক্ষ্য খুলনা দখল করা। ভৈরব নদী বেয়ে খুলনার দিকে চলেছে নৌজাহাজ দুটি।

জাহাজ দুটি খুলনার কাছাকাছি চলে আসলে একটা বোমারু বিমান থেকে জাহাজ দুটির ওপর বোমা এসে পড়ে। রুহুল আমিন তখন বিএনএস পলাশের ইঞ্জিনরুমে ছিলেন। ইঞ্জিনরুমের ওপরে বোমা পড়ে। ইঞ্জিনে আগুন ধরে যায়। তাঁর ডান হাত উড়ে যায়। তিনি আহত অবস্থাতেই ঝাঁপ দিয়ে নদী সাঁতরে পাড়ে উঠলেন। বোমার আঘাত থেকে তিনি প্রাণে রক্ষা পেলেন। কিন্তু রাজাকারদের হাতে নির্মমভাবে মৃত্যু হলো তাঁর। তিনি শহিদ হলেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৯৩৫ সালে নোয়াখালী জেলার বাঘচাপড়া গ্রামে।
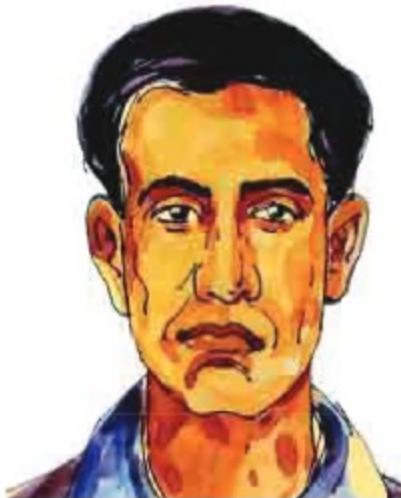
লাখো শহিদের রক্তের বিনিময়ে আমরা ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করি। এই দেশকে আমাদের সুন্দর করে গড়ে তুলতে হবে।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

টহল　আসন্ন　অবধারিত　রক্তস্রোতে　রঞ্জিত　শায়িত

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

নূর মোহাম্মদ শেখ	নান্নু মিয়া	গৌরব	১৯৪৩ ৮ই মে	রুহুল আমিন

ক. ল্যান্সনায়েক নূর মোহাম্মদ শেখের দলে ছিলেন অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা ....।

খ. নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে .... সেদিন এভাবেই রক্ষা করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন।

গ. ল্যান্সনায়েক মুন্সী আবদুর রউফ........................ সালের ....ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারি থানার সালামতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

ঘ. এই যুদ্ধে জয়ী বাহিনী হিসেবে মুক্তিযোদ্ধারা বয়ে এনেছেন অসীম .... ।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. নূর মোহাম্মদ শেখ কীভাবে নিজের জীবন তুচ্ছ করে মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন বাঁচিয়েছিলেন?

খ. ল্যান্সনায়েক মুন্সী আবদুর রউফের যুদ্ধের ঘটনাটা লিখি।

গ. বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন কীভাবে শহিদ হয়েছিলেন?

ঘ. পাঠ থেকে মুক্তিযুদ্ধের বীরযোদ্ধাদের সম্পর্কে যা জেনেছি তা নিজের ভাষায় লিখি।

৪. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

দুরন্ত	শান্ত	শান্ত ছেলেটি শুধু পড়তে ভালোবাসে।
অসীম	....	....
সুনাম	....	....
বীর	....	....
জয়	....	....
জীবন	....	....

৬. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. বাবা মারা যাওয়ার পর নূর মোহাম্মদ কিসে যোগ দিলেন?

১. বাংলাদেশ রাইফেলসে ২. ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসে

৩. বাংলাদেশ নেভিতে ৪. কোনোটিই না

খ. মুন্সী আবদুর রউফ মারা গিয়েছিলেন–

১. গুলিতে ২. গোলার আঘাতে

৩. গ্রেনেড বিস্ফোরণে ৪. পানিতে ডুবে

গ. মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে পাকিস্তানিদের কয়টি স্পিডবোট ডুবে গিয়েছিল?

১. পাঁচটি ২. আটটি

৩. সাতটি ৪. নয়টি

৭. আমাদের জাতীয় দিবসগুলোর পাশে তারিখবাচক শব্দ লিখি ।

ক. শহিদ দিবস–

খ. স্বাধীনতা দিবস–

গ. বাংলা নববর্ষ–

ঘ. শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস–

ঙ. বিজয় দিবস–

২০২৫

সবার আমি ছাত্র

সুনির্মল বসু

আকাশ আমায় শিক্ষা দিল
উদার হতে ভাই রে,
কর্মী হবার মন্ত্র আমি
বায়ুর কাছে পাই রে।

পাহাড় শিখায় তাহার সমান –
হই যেন ভাই মৌন-মহান,
খোলা মাঠের উপদেশে –
দিল-খোলা হই তাই রে।

সূর্য আমায় মন্ত্রণা দেয়
আপন তেজে জ্বলতে,
চাঁদ শিখাল হাসতে মোরে,
মধুর কথা বলতে।

মাটির কাছে সহিষ্ণুতা
পেলাম আমি শিক্ষা,
আপন কাজে কঠোর হতে
পাষাণ দিল দীক্ষা।

বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর,
সবার আমি ছাত্র,
নানান ভাবে নতুন জিনিস
শিখছি দিবারাত্র।

এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়,
পাঠ্য যেসব পাতায় পাতায়
শিখছি সে সব কৌতূহলে,
নেই দ্বিধা লেশমাত্র।

[অংশবিশেষ]

২০২৫

অনুশীলনী

১. কবিতার মূলভাব জেনে নিই।

প্রকৃতির কাছে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। বিশাল আকাশের দিকে আমরা যখন তাকাই, তখন তার কাছে শিক্ষা পাই উদারতার। তেমনিভাবে বায়ুর কাছে শিক্ষা পাই কর্মী হওয়ার, পাহাড়ের কাছে শিক্ষা পাই মৌন-মহান হওয়ার, খোলা মাঠের কাছে দিল-খোলা হওয়ার। সূর্যের কাছে শিখি আপন তেজে দীপ্ত হতে, চাঁদের কাছে শিখি মধুরতা ও নম্রতা। সাগরের কাছে শিখি বিশাল অন্তরের অধিকারী হতে, আর নদীর কাছে শিখি দ্রুত বেগে ছুটতে। এমনিভাবে মাটি, পাথর, ঝরনা প্রভৃতির কাছ থেকেও আমাদের অনেক শেখার আছে। তাই এ বিশাল পৃথিবী আমাদের শেখার ও জানার এক বিরাট পাঠশালা।

২. নিচের শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই ও বাক্যে প্রয়োগ করি।

উদার – মহৎ, দানশীল। – উদার মনের মানুষকে সবাই ভালোবাসে।

মৌন-মহান – নীরব ও শ্রেষ্ঠ। –পাহাড় ও আকাশ মৌন-মহান হওয়ার শিক্ষা দেয়।

দিল-খোলা – মুক্তপ্রাণ, উদারহৃদয়। –কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন দিল-খোলা মানুষ।

মন্ত্রণা – পরামর্শ, যুক্তি, উপদেশ। – মহান শিক্ষকের কাছে যে মন্ত্রণা লাভ করেছি তা আমার জীবনে সবচেয়ে বড় শিক্ষা।

সহিষ্ণুতা – সহ্যশক্তি, সহনশীলতা। – সহিষ্ণুতা মহৎ গুণ।

দীক্ষা – কোনো বিদ্যায় বা কাজে কিংবা সংকল্প সাধনে বিশেষ উপদেশ লাভ।
– আমি শিক্ষকের কাছে থেকে দেশপ্রেমের দীক্ষা গ্রহণ করেছি।

৩. যুক্তবর্ণ চিনে নিই।

সহিষ্ণুতা – ষ্ণ (ষ্+ণ) : কৃষ্ণ, তৃষ্ণা।

মন্ত্রণা – ন্ত্র (ন্+ত্+র) : যন্ত্রণা, অন্ত্র।

৪. কথাগুলো বুঝে নিই।

হই যেন ভাই মৌন-মহান—পাহাড় আকারে বড়ো হলেও নিজেকে নিয়ে বড়াই করে না। কবি বলতে চান যে, পাহাড় বড়ো হলেও শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করে না। তেমনি মানুষও নানাগুণের অধিকারী হবে, কিন্তু আত্মপ্রচার বা অহংকার করবে না।

দিল-খোলা হই তাই রে – খোলা মাঠে আমরা যে দিকে ইচ্ছা সে দিকে যেতে পারি। মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতে পারি। খোলা মাঠ প্রশস্ততার প্রতীক। এ জন্য বলা হয়েছে, খোলা মাঠ আমাদের মনের প্রসারতা বাড়ানোর শিক্ষা দেয়।

অন্তর হোক রত্ন-আকর – সাগরে মুক্তা ও প্রবাল পাওয়া যায়। এসব জিনিস খুব মূল্যবান। সাগর যেমন নানা রকম মণিমুক্তা ধারণ করে, তেমনি আমাদের অন্তরও সুন্দর গুণাবলিতে পরিপূর্ণ থাকা উচিত।

বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর – এই বিশ্ব অনেক বড়। তার কাছ থেকে আমাদের শিক্ষার শেষ নেই। তাই পৃথিবীকে বলা হয় একটি বিশাল পাঠশালা।

৫. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে মুখে বলি ও লিখি।

ক. আকাশ, বায়ু ও পাহাড় আমাদের কী শিক্ষা দেয়?
খ. খোলা মাঠ কী উপদেশ দেয়?
গ. সূর্য ও চাঁদ আমাদের কী শেখায়?
ঘ. মাটি কীভাবে আমাদের সহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয়?
ঙ. 'বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর' এ কথার অর্থ কী?
চ. সাগর ও নদী আমাদের কী শেখায়?

৬. বিপরীত শব্দগুলো মিলিয়ে লিখি।

উদার – নেভা
মৌন – অসহিষ্ণুতা
খোলা – কোমল
জ্বলা – অনুদার
সহিষ্ণুতা – বন্ধ
কঠোর – মুখর

৭. একই অর্থ হয় এমন শব্দগুলো জেনে নিই।

আকাশ – গগন, অম্বর, আসমান
বায়ু – বাতাস, হাওয়া, পবন, সমীরণ
পাহাড় – পর্বত, শৈল, গিরি
সূর্য – রবি, তপন, দিবাকর, প্রভাকর
চাঁদ – চন্দ্র, শশী, বিধু, ইন্দু, শশাঙ্ক
নদী – তটিনী, নির্ঝরিণী, প্রবাহিণী, স্রোতস্বিনী
মাটি – ভূমি, মৃত্তিকা
পৃথিবী – ধরণী, ধরা, ধরিত্রী, বসুন্ধরা

কবি পরিচিতি

সুনির্মল বসু

কবি ও শিশু সাহিত্যিক সুনির্মল বসু ভারতের বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্যের গিরিডিতে ১৯০২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ঢাকার বিক্রমপুরের মালখানগর গ্রামে। শিশু-কিশোরদের জন্য তাঁর অজস্র ছড়া, কবিতা, গল্প, কাহিনি, রূপকথা, ভ্রমণ কাহিনি, হাসির নাটক ও উপন্যাস রয়েছে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হল: 'ছানাবড়া', 'বেড়ে মজা', 'হেঁটে', 'হুলস্থুল', 'পাততাড়ি', 'শহুরে মামা', 'ছন্দের টুংটাং' ইত্যাদি। তিনি ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

শখের মৃৎশিল্প

গ্রামের নাম আনন্দপুর। সেখানে আমার মামার বাড়ি। মামাবাড়ি খুব মজা। পড়া নেই, বাধা নেই, যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াও, যা খুশি খাও। গেল বছর পহেলা বৈশাখের ছুটিতে মামা বাড়ি গিয়েছিলাম। সেখানে পহেলা বৈশাখের মেলা বসে। মামা বললেন, তোমাদের মেলা দেখতে নিয়ে যাব।

শখের হাঁড়ি

আমরা ছিলাম চারজন– আমি, মামাতো বোন বৃষ্টি, সোহানা আর ছোটো ভাই তাজিন। মামা বেশ মজার মানুষ। তিনি ছবি আঁকেন, বাঁশি বাজান। তাঁর কাঁধে ঝোলানো একটা ব্যাগ। তাতে থাকে রঙ-তুলি আর বাঁশি।

মেলার একটু কাছে পৌঁছতেই শুনতে পেলাম নাগরদোলার ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ। দেখলাম বাঁশের তৈরি কুলো, ডালা, ঝুড়ি, চালুন, মাছ ধরার চাঁই, খালুই। আরও কত কী! বসেছে বাঙি, তরমুজ, মুড়ি-মুড়কি, জিলাপি আর বাতাসার দোকান সারি সারি। আরেকটু এগোতেই দেখতে পেলাম কত রঙের, কত বর্ণের বিচিত্র সব মাটির হাঁড়ি! ফুল, পাতা, মাছের ছবি আঁকা সেসবে। রয়েছে মাটির ঘোড়া, হাতি, ষাঁড় আর নানা আকারের মাটির পুতুল। আমার চোখ পড়ল কাজ করা অপূর্ব সুন্দর মাটির হাঁড়ির দিকে। মামাকে জিজ্ঞেস করলাম–এটা কিসের হাঁড়ি?

২০২৫

মামা বললেন, এটা শখের হাঁড়ি। শখ করে পছন্দের জিনিস এই সুন্দর হাঁড়িতে রাখা হয়। তাই এর নাম শখের হাঁড়ি।

আমরা দুটি শখের হাঁড়ি কিনলাম। অবাক হলাম, পুতুলের পাশেই ঘোলা চোখে চেয়ে আছে এক চকচকে রুপালি ইলিশ। পদ্মার তাজা ইলিশের মতোই। তেমনি সাদা আঁশ, লাল ঠোঁট। আমরা একটা মাটির ইলিশও কিনলাম। মামা বললেন, ওই যে পুতুলগুলো দেখছ ওগুলো টেপা পুতুল। নরম এঁটেল মাটি টিপে টিপে এসব পুতুল বানানো হয়। যেমন— বর-কনে, কৃষক, নথপরা ছোট্ট মেয়ে—নানা রকমের মাটির টেপা পুতুল। মেলার এক প্রান্তে বড় জায়গা জুড়ে এসব মাটির পুতুলের দোকান। মামা বললেন, এগুলো হচ্ছে মাটির শিল্পকলা। মামা বুঝিয়ে বললেন– যখন কোনো কিছু সুন্দর করে আঁকি বা বানাই অথবা গাই, তখন তা হয় শিল্প। শিল্পের এ কাজকে বলে শিল্পকলা। আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প হচ্ছে মাটির শিল্প। এ দেশের কুমার সম্প্রদায় যুগ যুগ ধরে তৈরি করে আসছে মাটির জিনিস। যেমন– কলস, হাঁড়ি, সরা, বাসনকোসন, পেয়ালা, সুরাই, মটকা, জালা, পিঠে তৈরির নানা ছাঁচ। আরও কত কী!

টেপা পুতুল

মাটির তৈরি শিল্পকর্মকে আমরা বলি মাটির শিল্প বা মৃৎশিল্প। এ শিল্পের প্রধান উপকরণ হলো মাটি। তবে যেকোনো মাটি দিয়ে এ কাজ হয় না। দরকার পরিষ্কার এঁটেল মাটি। দোআঁশ মাটি তেমন আঠালো নয়। আর বেলে মাটি তো ঝরঝরে – তাই এগুলো দিয়ে মাটির শিল্প হয় না। অনেক যত্ন আর শ্রম দিয়ে মাটির শিল্পকর্ম তৈরি করতে হয়। কুমারদের কাছে এসব খুব সহজ। কারণ তারা বংশ পরম্পরায় এ কাজ করে আসছে।

টেপা পুতুল

২০২৫

কাঠের চাকায় মাটির পাত্র তৈরি করা

মেলা থেকে সেদিন আমরা অনেক টেপা পুতুল, ঘোড়া, হাতি ও ছোট কলস কিনলাম। মামা বললেন, এত সুন্দর নকশা দেখছ, রং দেখছ–এ সবই গ্রামের শিল্পীদের তৈরি। নকশাগুলো তাঁরা মন থেকে আঁকেন। আর রং তৈরি করেন শিম, সেগুন পাতার রস, কাঁঠাল গাছের বাকল থেকে। তবে আজকাল বাজার থেকে কেনা রংও লাগানো হয়। মেলা থেকে কদমা, বাতাসা, মুড়কি ও খই কিনে শখের হাঁড়ি ভর্তি করে আমরা ফিরলাম। খুব মজা হলো।

মামা বললেন, তোমাদের কাল কুমারপাড়ায় নিয়ে যাব। পরদিন আমরা কুমারপাড়া দেখতে গেলাম। আনন্দপুর গ্রামের উত্তর দিকে আট-দশ ঘর বসতবাড়ি। এই নিয়ে কুমারপাড়া। এখানে সবাই ব্যস্ত। কেউ মাটির তাল চাক করে সাজিয়ে রাখছেন। কেউ-বা কাঠের চাকায় মাটি লাগিয়ে নানা আকারের পাত্র বানাচ্ছেন। কেউ-বা এগুলো সারি সারি করে শুকোতে দিচ্ছেন রোদে। পাশেই রয়েছে মাটির জিনিস পোড়ানোর চুলা। উঁচু ছোট্ট ঢিবির মতোই চুলা। মাটির পোড়া গন্ধ পাচ্ছি। আর ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও কাজ করছে। মামা বললেন, হাঁড়ি, কলসি ছাড়াও আমাদের দেশে একসময় টেরাকোটার কাজ হতো।

২০২৫

নকশা করা মাটির ফলক ইটের মতো পুড়িয়ে তৈরি করা হতো এই টেরাকোটা। শালবন বিহার, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার ও দিনাজপুরের কান্তজীউ মন্দিরে এই টেরাকোটার কাজ রয়েছে। ছোট ছোট ফলককে পাশাপাশি জোড়া দিয়ে বড়ো করা যায়। মামা বললেন,এসব কাজ এ দেশে শুরু হয়েছে হাজার বছর আগে।

আজকাল কি পোড়ামাটির এই শিল্পচর্চা হয় না? মামার কাছে জানতে চাইলাম আমরা। মামা বললেন, আজকাল ওরকম টেরাকোটা হচ্ছে না বটে, তবে পোড়ামাটির নকশার কদর বেড়েছে। আজকাল সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য নানা রকম নকশা করা মাটির ফলক ব্যবহৃত হচ্ছে। বললাম, আমরা এসব পোড়ামাটির কাজ দেখতে চাই। মামা বললেন, সুযোগমতো একসময় তোমাদের শালবন বিহারে নিয়ে যাব।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

শখ   টেপা পুতুল   নকশা   টেরাকোটা   মৃৎশিল্প   শখের হাঁড়ি

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

শখ	নকশা	মৃৎশিল্প	টেপা পুতুল

ক. এই যে .... দেখছ, এসবই গ্রামের শিল্পীদের তৈরি।

খ. মাটির পুতুল জমানো আমার একটি ....।

গ. মাটির তৈরি শিল্পকর্মকে .... বলে।

ঘ. আমরা মেলা থেকে অনেক .... কিনলাম।

৩. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. আনন্দপুরে কখন মেলা বসে?

১. ষোলই ডিসেম্বর　　২. পহেলা বৈশাখ

৩. একুশে ফেব্রুয়ারি　　৪. পহেলা ফাল্গুন

খ. মামার ব্যাগে কী কী থাকে?

১. চিরুনি, বাঁশি　　২. আয়না, রঙ-তুলি

৩. রঙ-তুলি, বাঁশি　　৪. বাঁশি, চকলেট

গ. মৃৎশিল্পের প্রধান উপাদান হচ্ছে –

১. বাঁশ　　২. কাঠ

৩. পানি　　৪. মাটি

ঘ. আমাদের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প হচ্ছে –

১. চারুশিল্প　　২. মৃৎশিল্প

২. কারুশিল্প　　৪. দারুশিল্প

ঙ. কুমার সম্প্রদায় কিসের কাজ করে–

১. বাঁশের কাজ　　২. কাঠের কাজ

৩. পাকা বাড়ির কাজ　　৪. মাটির কাজ

চ. গ্রামের শিল্পীরা রং তৈরি করেন–

১. আম ও লাউ পাতা থেকে　　২. শিম ও কাঁঠাল গাছের বাকল থেকে

৩. সরিষা ফুল থেকে　　৪. পান ও চুন থেকে

ছ. পোড়া মাটির ফলকের অন্য নাম–

১. টেপা পুতুল　　২. টেরাকোটা

৩. শখের হাঁড়ি　　৪. মৃৎশিল্প

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. মাটির শিল্প বলতে কী বুঝি?

খ. বাংলাদেশের প্রাচীন শিল্পকর্ম কোনটি?

গ. শখের হাঁড়ি কী রকম?

ঘ. বৈশাখী মেলায় কী কী পাওয়া যায়?

ঙ. কয়েকটি মৃৎশিল্পের নাম বলি।

চ. টেরাকোটা কী?

ছ. বাংলাদেশের কোথায় পোড়ামাটির প্রাচীন শিল্প দেখতে পাওয়া যায়?

জ. মাটির শিল্প কেন আমাদের ঐতিহ্য ও গৌরবের বিষয়?

৭. বাংলাদেশের প্রাচীন স্থাপত্যগুলোকে চিনি।

কান্তজীউ মন্দির ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা রামনাথ রায় দিনাজপুরের কান্তজীউ মন্দির নির্মাণ করেন। এ মন্দিরের গায়ে রয়েছে অপূর্ব সুন্দর টেরাকোটা।
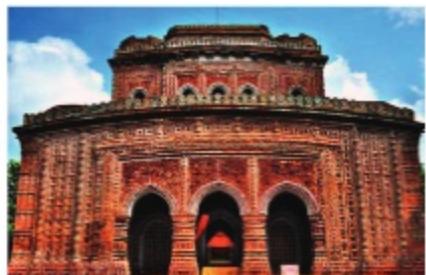
পাহাড়পুর নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন সোমপুর বিহার। এগুলো অষ্টম শতকের অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় বারোশ বছর আগের তৈরি।

শালবন বিহার কুমিল্লার ময়নামতিতে মাটি খুঁড়ে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন। এটা অষ্টম শতকের তৈরি। শালবন বিহারে পাওয়া গেছে নানা ধরনের পোড়ামাটির ফলক।

মহাস্থানগড় বগুড়া শহর থেকে ১৮ কিলোমিটার উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত মহাস্থানগড়। যিশু খ্রিস্টের জন্মের পূর্বে তৃতীয় থেকে পরবর্তী পনেরো শতকে বাংলার এ প্রাচীন নগর গড়ে ওঠে।

৮. কর্ম-অনুশীলন।

আমার দেখা কোনো হস্তশিল্প বা হাতের কাজ সম্পর্কে লিখি।

শব্দদূষণ

সুকুমার বড়ুয়া

গরু ডাকে হাঁস ডাকে–ডাকে কবুতর
গাছে ডাকে শত পাখি সারা দিনভর।
মোরগের ডাক শুনি প্রতিদিন ভোরে
নিশিরাতে কুকুরের দল ডাকে জোরে।
দোয়েল চড়ুই মিলে কিচির মিচির
গান শুনি ঘুঘু আর টুনটুনিটির।

শহরের পাতি কাক ডাকে ঝাঁকে ঝাঁকে
ঘুম দেয়া মুশকিল হর্নের হাঁকে।
সিডি চলে, টিভি চলে, বাজে টেলিফোন
দরজায় বেল বাজে, কান পেতে শোন।
গলিপথে ফেরিঅলা হাঁকে আর হাঁটে
ছোটদের হইচই ইশকুল মাঠে।

পল্লির সেই সুরে ভরে যায় মন
শহুরে জীবন জ্বালা–শব্দদূষণ।

২০২৫

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

নিশিরাত কিচির মিচির ফেরিঅলা শব্দদূষণ

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ফেরিঅলা	নিশিরাত	শব্দদূষণ	কিচির মিচির

ক. .... চেঁচামেচি করো না, সবাই ঘুমুচ্ছে।

খ. ভোর বেলাতেই পাখির .... শুনতে শুনতে আমার ঘুম ভাঙে।

গ. .... হাঁক দিচ্ছে–থালাবাসন চাই?

ঘ. .... আমাদের শোনার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কবিতায় কোন কোন পশু ও পাখির কথা বলা হয়েছে?
খ. শহরে কী কারণে শব্দদূষণ হয়?
গ. কুকুরের ডাক আর পাখির ডাকের মধ্যে কোনটি তোমার ভালো লাগে? কেন?
ঘ. গ্রামের মানুষ কোন পাখির ডাক শুনে ঘুম থেকে ওঠে?

৪. শহুরে জীবনের সাথে গ্রামের জীবনের তুলনা করি ও লিখি।

বিষয়বস্তু	শহুরে জীবন	গ্রামের জীবন
পরিবেশ		
শব্দ		
রাস্তাঘাট		
জীবনযাত্রা		
হাটবাজার		

৫. কথাগুলো বুঝে নিই।

পল্লির সেই সুরে ভরে যায় মন
শহুরে জীবন জ্বালা–শব্দদূষণ।

শহরে শান্তিতে বসবাস করা মুশকিল। কারণ হাজার রকমের শব্দ কান ঝালাপালা করে দেয়। গ্রামে শব্দ অনেক কম, তার ফলে মনের শান্তি বজায় থাকে।

৬. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

কবি-পরিচিতি
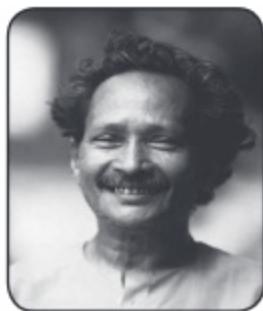
সুকুমার বড়ুয়া

সুকুমার বড়ুয়া বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত ছড়াকার। তিনি ১৯৩৮ সালের ৫ই জানুয়ারি চট্টগ্রামের রাউজান থানার বিনাজুরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থ : 'পাগলা ঘোড়া', 'ভিজে বেড়াল', 'চন্দনা রঞ্জনার ছড়া', 'এলোপাতাড়ি', 'নানা রঙের দিন', 'চিচিংফাঁক' প্রভৃতি। তিনি শিশুসাহিত্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেছেন।

স্মরণীয় যাঁরা বরণীয় যাঁরা

বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, পুলিশ, সৈনিক, কর্মকর্তা, নারী, শিশুসহ সর্বস্তরের মানুষ। আছেন সমতল, পাহাড়, হাওড়, নদী, উপকূলসহ সকল অঞ্চলের মানুষ। সকল ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি ও পেশার মানুষ মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন।

১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ গভীর রাতে পাকিস্তানি সেনারা ঢাকার নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আক্রমণ চালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে, ব্যারাকে, আর নানা আবাসিক এলাকায়। নির্বিচারে হত্যা করে ঘুমন্ত মানুষকে। নয় মাস ধরে তারা হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যায়। তারা পরিকল্পনা করে একে একে হত্যা করে এদেশের মেধাবী, আলোকিত ও বরেণ্য মানুষদের। পঁচিশে মার্চের মধ্যরাতে শহিদ হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এম. মুনিরুজ্জামান, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব প্রমুখ।

গোবিন্দচন্দ্র দেব

সেলিনা পারভীন

গিয়াসউদ্দিন আহমদ

রণদাপ্রসাদ সাহা
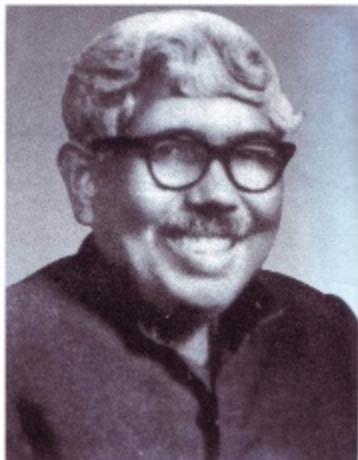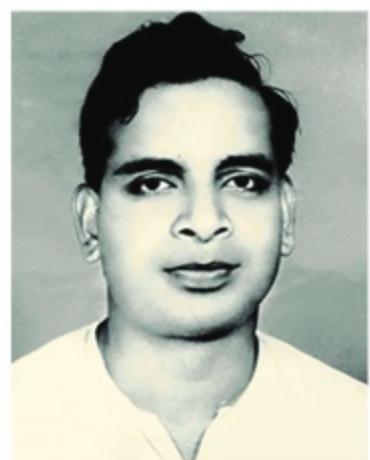
মুনীর চৌধুরী
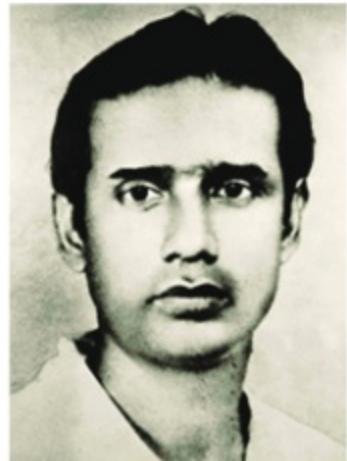
রাশীদুল হাসান

বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন এম. মুনিরুজ্জামান। প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ শুনে তিনি পবিত্র কুরআন পড়া শুরু করেন। কুরআন পাঠরত মানুষটিকেই টেনে হিঁচড়ে নিচে নামায় পাকিস্তানি সেনারা। একই বাড়ির নিচতলায় থাকতেন অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। তিনি ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের খ্যাতিমান শিক্ষক। তাঁকেও শত্রুসেনারা টেনে হিঁচড়ে বের করে আনে। তারপর দুজনকেই গুলি করে হত্যা করে। এ বাড়ির খুব কাছেই এক বাসায় থাকতেন অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব। দর্শনশাস্ত্রের খ্যাতনামা শিক্ষক ছিলেন তিনি। মানুষ হিসেবে ছিলেন খুব সহজ-সরল আর নিরহংকার। ওই একই রাতে তাঁকেও হত্যা করা হয়। হত্যা করা হয় আরও কয়েকজন শিক্ষককে।

পঁচিশে মার্চ রাতে আক্রান্ত হয় সংবাদপত্র অফিসগুলোও। অনেক অফিসে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। হত্যা করে বহু সাংবাদিককে। সেই রাতে লেখক ও সাংবাদিক শহিদ সাবের পত্রিকা অফিসেই ঘুমাচ্ছিলেন। ঘুমন্ত অবস্থায় পুড়ে মারা যান তিনি। শহিদ হন সেলিনা পারভীন। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে প্রাণ দেন কবি-সাংবাদিক মেহেরুন্নেসা।

হানাদাররা হত্যা করে প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে তিনিই প্রথম বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার

দাবি তুলেছিলেন। কুমিল্লার বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে শত্রুসেনারা তাঁকে হত্যা করে। অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ দেশবাসীর স্বাস্থ্যসেবার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সাধনা ঔষধালয়। ৮৪ বছর বয়সের এই মানুষটিও রেহাই পাননি। তাঁকেও হত্যা করে পাকিস্তানি সেনারা।

এ দেশের সাধারণ মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন রণদাপ্রসাদ সাহা। দানশীলতার জন্য লোকে তাঁকে ডাকত 'দানবীর' বলে। হত্যা করা হয় তাঁকেও। চট্টগ্রামের বিখ্যাত সমাজসেবক ছিলেন নূতনচন্দ্র সিংহ। শত্রুসেনারা তাঁকেও রেহাই দেয়নি।

একুশে ফেব্রুয়ারিতে ভাষা শহিদদের স্মরণ করে আমরা ফুল দিতে যাই শহিদ মিনারে। তখন আমাদের মনে আর মুখে বেজে ওঠে একটি গান–'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি।' এ গানে সুর দেন আলতাফ মাহমুদ। এই সুরসাধকের প্রাণ কেড়ে নেয় পাকিস্তানি বাহিনী।

মুক্তিযুদ্ধের একেবারে শেষের দিকে পাকিস্তানিরা বুঝতে পারে যে, তাদের পরাজয় অবধারিত। তখন তারা এদেশকে মেধাশূন্য করার ষড়যন্ত্র করে। তারা জানত চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও সৃষ্টিশীল মানুষদের হত্যা করলে এদেশের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। তখন তারা সেই ক্ষতি করার কাজ শুরু করে। নতুন করে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর। তারা ধরে নিয়ে যায় অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ও অধ্যাপক আনোয়ার পাশাকে। তাঁরা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান শিক্ষক। তুলে নিয়ে যায় ইতিহাসের অধ্যাপক সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহমদকে। ইংরেজির অধ্যাপক রাশীদুল হাসানও বাদ পড়েন না। এর আগেই হত্যা করে সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেনকে।

তারা প্রখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক শহীদুল্লা কায়সারকে তুলে নিয়ে যায়। সাংবাদিক নিজাম উদ্দীন আহমদ ও আ.ন.ম. গোলাম মোস্তফা, প্রখ্যাত চিকিৎসক ফজলে রাব্বী, আবদুল আলীম চৌধুরী ও মোহাম্মদ মোর্তজাকেও একইভাবে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। ধরে নিয়ে যাওয়া হয় আরও বহু জনকে। এঁরা কেউই আর জীবিত ফিরে আসেননি।

দেশ স্বাধীন হবার পরে এ সকল বুদ্ধিজীবীর অনেকের ক্ষত-বিক্ষত লাশ পাওয়া যায় মিরপুর ও রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে। আবার অনেকের কোনো সন্ধানও পাওয়া যায়নি।

শহীদুল্লা কায়সার

আনোয়ার পাশা

ফজলে রাব্বী
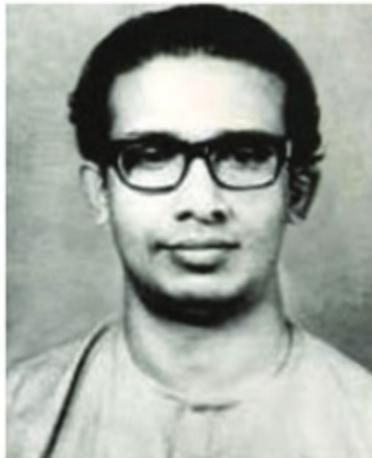
তাঁদের স্মরণে প্রতিবছর ১৪ই ডিসেম্বর আমরা পালন করি 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস'। জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান ছিলেন তাঁরা। তাঁদের আত্মদান আমরা কখনো ব্যর্থ হতে দেব না। আমরা তাঁদের স্মরণ করব চিরদিন।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

অবরুদ্ধ অবধারিত আত্মদানকারী নির্বিচারে বরেণ্য পাষণ্ড মনস্বী খ্যাতনামা

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

অবরুদ্ধ	অবধারিত	আত্মদানকারী	বরেণ্য	নির্বিচারে	খ্যাতনামা	মনস্বী

ক. তারা বুঝতে পারে যে, তাদের পরাজয় ....।

খ. দেশের ভিতরে .... জীবনযাপন করতে করতে প্রাণ দেন এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ।

২০২৫

গ. পাকিস্তানিরা একে একে হত্যা করে এদেশের মেধাবী, আলোকিত ও .... মানুষদের।

ঘ. মুক্তিযুদ্ধে শহিদরা মহান .... হিসাবে চিরস্মরণীয়।

ঙ. পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনারা .... হত্যা করে নিদ্রিত মানুষকে।

চ. অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব ছিলেন দর্শনশাস্ত্রের .... শিক্ষক।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা এদেশে কী করেছিল?

খ. কোন শহিদ বুদ্ধিজীবী প্রথম পাকিস্তানি গণপরিষদে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান? তাঁর সম্পর্কে বলি ও লিখি।

গ. শহিদ সাবের কে ছিলেন? তিনি কীভাবে শহিদ হন?

ঘ. রণদাপ্রসাদ সাহাকে কেন দানবীর বলা হয়?

ঙ. দুজন শহিদ সাংবাদিকের নাম বলি।

চ. আমরা কেন চিরদিন শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ করব?

ছ. কোন দিনটিকে 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' হিসেবে পালন করা হয়? কেন?

৪. বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের ঠিক শব্দ মিলিয়ে পড়ি ও লিখি।

বরণ করার যোগ্য	মেধাবী
মেধা আছে এমন যে জন	নিরহংকার
অহংকার নেই যার	বরেণ্য
বিচার-বিবেচনা ছাড়া যা	অপূরণীয়
কোনোভাবেই পূরণ করা যায় না এমন	নির্বিচার

৫. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. কোন তারিখে পাকিস্তানি সেনারা ঢাকার নিরস্ত্র, ঘুমন্ত মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে?

১. ১৯৭১ সালের সাতাশে মার্চ
২. ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ
৩. ১৯৭১ সালের উনত্রিশে মার্চ
৪. ১৯৭১ সালের ছাব্বিশে মার্চ

খ. প্রতিবছর ১৪ই ডিসেম্বর পালন করা হয়–

১. 'স্বাধীনতা দিবস' হিসেবে
২. 'মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে
৩. 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' হিসেবে
৪. 'বিজয় দিবস' হিসেবে

গ. দেশ স্বাধীন হবার পর বুদ্ধিজীবীদের ক্ষত-বিক্ষত লাশ পাওয়া যায় –

১. মিরপুর ও রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে
২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে
৩. ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীতে
৪. সংবাদপত্র অফিসে

৬. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। ফাঁকা ঘরে ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ঘুমন্ত	জাগ্রত	স্বাধীন	পরাধীন	সাধু	অসাধু	লোভী	নির্লোভ	সরল	গরল

ক. .... অবস্থায় সংবাদ অফিসে শহিদ হন শহিদ সাবের।

খ. দেশ .... হবার পরে অনেক বুদ্ধিজীবীর লাশ পাওয়া যায়।

গ. এদেশের কৃষক .... জীবনযাপন করে।

ঘ. বাংলাদেশে অনেক .... সন্ন্যাসী বাস করে।

ঙ. আলবদর বাহিনীর লোকেরা ছিল অসাধু ও .... ।

৭. 'শহিদ বুদ্ধিজীবী' সম্পর্কে আমার অনুভূতি লিখি।

২০২৫

স্বদেশ

আহসান হাবীব

এই যে নদী
নদীর জোয়ার
নৌকা সারে সারে,
একলা বসে আপন মনে
বসে নদীর ধারে–
এই ছবিটি চেনা।
মনের মধ্যে যখন খুশি
এই ছবিটি আঁকি,
এক পাশে তার জারুল গাছে
দুটি হলুদ পাখি–
এমনি পাওয়া এই ছবিটি
কড়িতে নয় কেনা।

মাঠের পরে মাঠ চলেছে
নেই যেন এর শেষ
নানা কাজের মানুষগুলো
আছে নানান বেশ।
মাঠের মানুষ যায় মাঠে আর
হাটের মানুষ হাটে।
দেখে দেখে একটি ছেলের
সারাটি দিন কাটে।

এই ছেলেটির মুখ
সারাদেশের সব ছেলেদের
মুখেতে টুকটুক।
কে তুমি ভাই,
প্রশ্ন করি যখন
'ভালোবাসার শিল্পী আমি'
বলবে হেসে তখন।

'এই যে ছবি এমন আঁকা
ছবির মতো দেশ,
দেশের মাটি দেশের মানুষ
নানা রকম বেশ।
বাড়ি বাগান পাখপাখালি
সব মিলে এক ছবি,
নেই তুলি নেই রঙ, তবুও
আঁকতে পারি সবই।'

অনুশীলনী

১. কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ, অর্থাৎ নদী এদেশের মাতা বা মা। এদেশের সবখানেই নদী দেখা যায়। 'স্বদেশ' কবিতায় বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রার ছবি তুলে ধরা হয়েছে। একটি ছেলে সেই ছবি দেখছে ও তার মনের ভিতরে ধরে রাখছে। নদীর জোয়ার, নদীর তীরে নৌকা বেঁধে রাখা, গাছে গাছে পাখির কলকাকলি– সবই ছেলেটির ভাল লাগছে। তাই দেশের জন্য তার মায়া-মমতা ও ভালোবাসার অনুভূতি জাগছে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

কড়ি টুকটুক শিল্পী পাখপাখালি

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

টুকটুকে	বিখ্যাত	পাখপাখালির	কড়ি

ক. অনেক আগে এখনকার মতো টাকা-পয়সা ছিল না। তখন লোকে কেনা-বেচা করত .... দিয়ে।

খ. মেলা থেকে বোনের জন্য .... লাল একটা জামা কিনে আনব।

গ. জয়নুল আবেদিন ছিলেন একজন................................ চিত্রশিল্পী।

ঘ. বাংলাদেশের গাছে গাছে শোনা যায় .... কলকাকলি।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. গ্রাম বাংলার কোন ছবিটি আমাদের চেনা?

খ. কোন ছবিটি টাকা দিয়ে কেনা যায় না?

গ. স্বদেশ কবিতায় কী দেখে ছেলেটির দিন কেটে যায়?

ঘ. 'সব মিলে এক ছবি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

৫. নিচের কথাগুলো বুঝে নিই।

ক. এমনি পাওয়া এই ছবিটি
কড়িতে নয় কেনা।

বাংলাদেশ চির সবুজের দেশ। গাছে গাছে পাখি। এঁকেবেঁকে চলেছে অসংখ্য নদী। এর এক দিকে পাহাড়,একদিকে হাওড় আর অন্য দিকে সাগর। একদিকে ফসলের খেত, অন্যদিকে চা-বাগান। সবকিছুতেই প্রকৃতির এক অপরূপ ছোঁয়া। রং-তুলি দিয়ে আঁকা ছবি কেনা যায়, কিন্তু শান্ত-শ্যামল প্রকতির এই মন জুড়ানো ছবি টাকা-পয়সা দিয়ে কেনা যায় না।

খ. মাঠের পরে মাঠ চলেছে
নেই যেন এর শেষ।

সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা আমাদের এই বাংলাদেশ। মাঠে মাঠে ফসলের খেত। বাতাস বয়ে যায় তার ওপর দিয়ে। মনে হয়, নদীর ঢেউ মাঠে ছড়িয়ে পড়েছে। অবারিত খোলা সবুজ মাঠ, মাঝে মাঝে গ্রাম, আবার মাঠ। গ্রাম মাঠের সাথে মিশে যায়। মনে হয় সবকিছু মাঠের উপাদান। মাঠের পর মাঠ চলে গেছে, কোথাও যেন শেষ হচ্ছে না।

গ. এই যে ছবি এমন আঁকা
ছবির মতো দেশ,
দেশের মাটি দেশের মানুষ
নানা রকম বেশ।

নদী, নালা, পাহাড়, হাওড়, সমুদ্র সব মিলে এদেশ ছবির মতো। এদেশের প্রতিটি ঋতু বৈচিত্র্যময়।প্রকৃতি মাঝে মাঝে রং বদলায়। যেমন ছবিতে নানান রং ব্যবহার করা হয়, তেমনি এদেশের মানুষজনও নানারকমের বেশভূষা পরেন।

২০২৫

৬. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. নদীর তীরে সারি সারি কী রাখা ছিল?

১. জেলেদের জাল　　২. গাছের গুঁড়ি

৩. খড়ের গাদা　　৪. নৌকা

খ. ছেলেটির সারাদিন কীভাবে কাটে?

১. খেলাধুলা করে　　২. মাঠের মানুষ আর হাটের মানুষ দেখে

৩. পড়াশোনা করে　　৪. বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব করে

গ. 'স্বদেশ' কবিতায় ছেলেটি কীভাবে তার ছবি আঁকে?

১. রং-তুলি দিয়ে　　২. পেনসিল দিয়ে

৩. নিজের মনের মধ্যে　　৪. মা বাবার সহযোগিতা নিয়ে

ঘ. 'স্বদেশ' কবিতায় কবি বাংলাদেশের কোন ছবিটি তুলে ধরেছেন?

১. বাংলাদেশের শহরের মানুষের ছবি

২. নদীর পাড়ের জেলেদের ছবি

৩. বাংলাদেশের পাহাড়ি মানুষের ছবি

৪. বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রার ছবি

ঙ. 'এই ছেলেটির মুখ/সারাদেশের সব ছেলেদের মুখেতে টুকটুক'– কথাটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

১. ছেলেটির মুখের রং

২. ছেলেটির মুখের গড়ন

৩. ছেলেটির মুখের প্রতিচ্ছবি

৪. ছেলেটির মুখের কথা

৭. শূন্যস্থান পূরণ করি।

‘এই যে ছবি ....
..................মতো দেশ,
.... দেশের মানুষ
নানা রকম বেশ ।
বাড়ি বাগান ....
সব মিলে এক..................
নেই .... নেই ....তবুও
আঁকতে পারি সবই।’

৮. ডান দিক থেকে কবিতায় ব্যবহৃত ঠিক কথাটি নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

ক. একলা বসে আপন মনে বসে ....। পুকুর পাড়ে/গাছের তলে/নদীর ধারে

খ. এমনি পাওয়া এই ছবিটি .... নয় কেনা। টাকায়/কড়িতে/সোনায়

গ. এক পাশে তার জারুল গাছে দুটি ....। হলুদ পাখি/জারুল ফুল/শালিক পাখি

৯. কর্ম-অনুশীলন।

নিচের নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের দেশ সম্পর্কে একটি রচনা লিখি।

আমাদের দেশের নাম, দেশের সীমারেখা ও আয়তন, রাজধানী, বিভাগীয় শহর, প্রধান নদনদী, জনসংখ্যা ও ভাষা, জাতীয় প্রতীকসমূহ (ফুল, ফল, মাছ, পশু, পাখি), প্রকৃতি ও পরিবেশ।

কবি-পরিচিতি
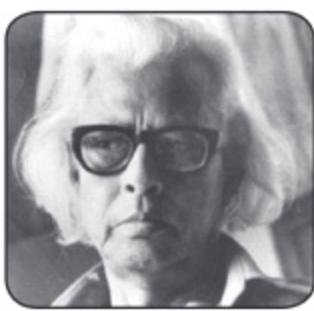
আহসান হাবীব

কবি আহসান হাবীব ২রা ফেব্রুয়ারি ১৯১৭ সালে পিরোজপুর জেলার শঙ্করপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শিশু-কিশোরদের জন্য তিনি প্রচুর ছড়া ও কবিতা লিখেছেন। তাঁর কবিতার ছন্দ ও শব্দ সহজেই মন কাড়ে। তিনি ছিলেন পেশায় সাংবাদিক। দীর্ঘদিন নানা পত্রিকায় সাহিত্য-পাতার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। ‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর’ ও ‘ছুটির দিন দুপুরে’ তাঁর শিশুতোষ কাব্যগ্রন্থ। ১৯৮৫ সালের ১০ই জুলাই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

কাঞ্চনমালা আর কাঁকনমালা

অনেক দিন আগের কথা। এক দেশে ছিল এক রাজা। রাজার একটাই পুত্র। রাজপুত্রের সঙ্গে সেই রাজ্যের রাখাল ছেলের খুব ভাব। দুই বন্ধু পরস্পরকে খুব ভালোবাসে। রাখাল মাঠে গরু চরায়, আর রাজপুত্র গাছতলায় বসে তার জন্য অপেক্ষা করে। নিঝুম দুপুরে রাখাল বাঁশি বাজায়। রাজপুত্র তার বন্ধু রাখালের পাশে বসে সেই সুর শোনে। বন্ধুর জন্য বাঁশি বাজিয়ে রাখাল বড়ো সুখ পায়। আর তা শুনে রাজপুত্রের মন খুশিতে নেচে ওঠে। রাজপুত্র বন্ধুর কাছে প্রতিজ্ঞা করে, বড়ো হয়ে রাজা হলে রাখালকে তার মন্ত্রী বানাবে।

তারপর একদিন রাজপুত্র রাজা হয়। লোকলস্কর, সৈন্যসামন্তে গমগম করে তার রাজপুরী। রাজপুরী আলো করে থাকে রানি কাঞ্চনমালা। চারদিকে সুখ। এত সুখের মধ্যে রাজপুত্রের আর রাখাল বন্ধুর কথা মনে পড়ে না। রাজপুত্র তার বন্ধুকে ভুলে যায়।

এদিকে রাখালের কিন্তু খুব মনে পড়ে রাজপুত্রের কথা। শেষে সে একদিন চলেই আসে বন্ধুকে একটুখানি দেখার জন্য। কিন্তু রাজপ্রাসাদের রক্ষীরা অমন গরিব মানুষকে ভিতরে ঢুকতে দেয় না। মনভরা কষ্ট নিয়ে সে সারাদিন প্রাসাদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু রাজার দেখা মেলে না। দিনশেষে মনের কষ্ট নিয়ে দুঃখী রাখাল কোথায় চলে যায়, কেউ তা জানে না।

একদিন ভোরবেলা যখন রাজার ঘুম ভাঙে, তখন দেখা যায় তাঁর সারা শরীরে গেঁথে আছে অগুনতি সুচ। রাজা কথা বলতে পারেন না, শুতে পারেন না, খেতেও পারেন না। রাজ্যজুড়ে কান্নাকাটির রোল পড়ে যায়। রাজা বোঝেন– প্রতিজ্ঞাভঙ্গের সেই অপরাধেই আজকে তার এই দশা। সবাই তাকে সুচ রাজা বলতে থাকেন। রানি কাঞ্চনমালা তখন রাজ্য দেখাশোনা শুরু করেন।

রানি একদিন নদীর ঘাটে স্নান করতে যান। কোথা থেকে জানি একটা মেয়ে এসে হাজির। মেয়েটি বলল, রানির যদি দাসীর দরকার হয়, তো সে দাসী হবে। রাজার শরীর থেকে সুচ খোলার জন্য একজন লোকের দরকার ছিল। তখন রানি কাঞ্চনমালা সেই মেয়েটাকে হাতের সোনার কাঁকন দিয়ে কিনে নিলেন। তাই তার নাম হলো কাঁকনমালা।

কাঁকনমালার কাছে গায়ের গয়নাগুলো রেখে রানি নদীতে ডুব দিতে গেলেন। আর চোখের পলকে কাঁকনমালা রানির সব শাড়ি–গয়না পরে নিল। রানি ডুব দিয়ে উঠে দেখেন দাসী হয়ে গেছে রানি, আর রানি কাঞ্চনমালা হয়ে গেছেন দাসী।

তখন নকল রানি কাঁকনমালার ভয়ে কাঁপতে থাকেন কাঞ্চনমালা। কাঁপতে থাকে রাজপুরীর সকলে। সকলে ভাবতে থাকে, তাদের রানি তো আগে এমন ছিল না।

সুচরাজা জানতেই পারেন না, তার রাজ্যে তখন কী হচ্ছে। দুখিনী কাঞ্চনমালা রাজবাড়ির সকল কাজকর্ম করেন। আর চোখের জল ফেলেন।

কাঞ্চনমালার একটুও ফুরসত থাকে না। কীভাবে সুচরাজার যত্ন করবে! কীভাবে তার পাশে দু-দণ্ড বসবে! নকল রানি রাজার দিকে ফিরেও তাকায় না। রাজার কষ্টের সীমা থাকে না। সুচের ব্যথায় সারা শরীর টনটন করে, চিনচিন করে জ্বলতে থাকে। গায়ে মাছি এসে বসে ঝাঁকে ঝাঁকে। কে তাকে বাতাস করবে, কে তাকে দেখবে!

একদিন নকল রানি কাঞ্চনমালাকে একগাদা কাপড় ধুতে পাঠায় নদীর ঘাটে। মাথায় কাপড়ের বোঝা নিয়ে কাঞ্চনমালা এক পা এগোন, এক পা থামেন। চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে যেতে থাকে। এমন সময় কাঞ্চনমালার কানে আসে, বনের পাশের গাছতলা থেকে কেমন এক অদ্ভুত মন্ত্র। কে জানি বলেই যাচ্ছে:

পাই এক হাজার সুচ, তবে খাই তরমুজ!
সুচ পেতাম পাঁচ হাজার, তবে যেতাম হাটবাজার!
যদি পাই লাখ, তবে দিই রাজ্যপাট!

লোকটার সাথে ছিল একটা সুতার পুঁটলি।

২০২৫

মাথার বোঝা নামিয়ে কাঞ্চনমালা ছুটে যান তার কাছে। বলেন, লাখ লাখ সুচ চাও তো? আমি দিতে পারি। এ কথা শুনে লোকটি ঝটপট তার সুতার পুঁটলি মাথায় তুলে নিয়ে কাঞ্চনমালার সাথে হাঁটা ধরে। পথে যেতে যেতে কাঞ্চনমালা চোখের জল ফেলতে ফেলতে তার সব দুঃখের কথা বলেন। অচেনা মানুষটা শোনে, আর মুখ থমথমে হয়ে যেতে থাকে তার।

রাজপুরীতে গিয়ে ওই অচিন মানুষটি সুচ নেবার কথাটা বলে না। বলে, আজকের দিন বড় শুভ দিন। আজ হচ্ছে পিটকুড়ুলির ব্রত, আজকের দিনে রানিদের পিঠা বিলাতে হয়– এমনই নিয়ম। নকল রানি পিঠা বানাতে যায়। সে কাঞ্চনমালাকেও পিঠা বানাতে ফরমাস দেয়। নকল রানি পিঠা বানায়। সে পিঠা কেউ মুখেও তুলতে পারে না, এমনই বিস্বাদ! দুখিনী কাঞ্চনমালা বানান চন্দ্রপুলি, মোহনবাঁশী, ক্ষীর মুরলি পিঠা। মুখে দেওয়া মাত্র সকলের মন ভরে যায়। এমনই স্বাদ তার। নকল রানি উঠানে আলপনা দিতে যায়। কোথায় নকশা, কোথায় কী– এখানে এক খাবলা, ওখানে এক খাবলা রং লেপে দেওয়া। কী যে অসুন্দর দেখায়! আর কাঞ্চনমালা আঁকেন পদ্মলতা। তার পাশে আঁকেন সোনার সাত কলস, ধানের ছড়া, ময়ূর-পুতুল। লোকে তখন বুঝতে পারে কে আসল রানি, আর কে দাসী।

তখন সেই অচেনা মানুষটা কাঁকনমালাকে ডেকে বলে, হাতের কাঁকনে কেনা দাসী, জলদি সত্যি কথা বল। কাঁকনমালার সে কী রাগ। সে গর্জে উঠে জল্লাদকে হুকুম দেয় অচেনা মানুষ আর কাঞ্চনমালার গর্দান নিতে। জল্লাদ ওদের ধরতে আসার আগেই অচেনা মানুষ তার সুতার পুঁটলিকে হুকুম দেয়। এক গোছা সুতা গিয়ে জল্লাদকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। নকল রানি আবার গর্জে ওঠার আগেই অচিন মানুষ নতুন মন্ত্র শুরু করে:

সূতন সূতন সরুলি, কোন দেশে ঘর
সুচরাজার সুচ গিয়ে আপনি পর।

সঙ্গে সঙ্গে সুতাগুলো রাজার গায়ের লাখ লাখ সুচে ঢুকে যায়। আবার মন্ত্র পড়ে অচিন মানুষ। তখন সব সুচ রাজার শরীর থেকে বেরিয়ে এসে নকল রানির চোখেমুখে, সারা গায়ে বিঁধে যায়। তখন সে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মারা যায়। কাঞ্চনমালার সকল দুঃখের দিন শেষ হয়।

এদিকে, রাজা বহু বছর পরে চোখ মেলেন। সামনে তাকিয়ে দেখেন দাঁড়িয়ে আছে তার সেই রাখাল বন্ধু! রাজা দুহাতে জড়িয়ে ধরেন তাকে। কথা দিয়ে কথা না রাখার জন্য রাজা তার কাছে ক্ষমা চান। বলেন,"আজ থেকে তুমি আমার মন্ত্রী। তুমি আমার পাশে থেকো! সারা জীবনের জন্য থেকো।" রাখাল বন্ধু কি তখন না থেকে পারে!

রাজা তাঁর বন্ধুকে নতুন সোনার বাঁশি গড়িয়ে দিলেন। সারাদিনের কাজ শেষে রাজা বন্ধুকে নিয়ে দূরের মাঠে চলে যান। পুরোনো দিনের মতো রাখাল বন্ধু বাঁশি বাজায়, আর রাজা শোনেন সেই সুর। সুখে রাজার মন ভরে যায়।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

আষ্টেপৃষ্ঠে গর্দান গর্জে ওঠা স্বাদ বিস্বাদ পুঁটলি ফরমাস ঘোর ফুরসত
টনটন চিনচিন মায়াবতী কাঁকন রক্ষী রাজপ্রাসাদ পরস্পর

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

পরস্পরের	বিস্বাদ	আষ্টেপৃষ্ঠে	পুঁটলিটি	ফুরসত	টনটন

ক. তার হাতের রান্না এমন .... যে মুখেই তোলা যায় না।

খ. বৃদ্ধ লোকটি তার .... সযত্নে একপাশে রেখে দিল।

গ. লোকটির কাজের চাপ এত বেশি যে দম ফেলার .... নেই।

ঘ. তার সমস্ত শরীর ব্যথায় .... করছে।

ঙ. তারা দুজন .... বন্ধু।

চ. গ্রামের মায়া ছেলেটিকে .... বেঁধে রেখেছে।

২০২৫

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. রাজপুত্র কোথায় বসে রাখাল বন্ধুর বাঁশি শুনত?
খ. রাজপুত্র রাখাল বন্ধুর কথা ভুলে যায় কেন?
গ. রাজা কেন মনে করলেন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কারণেই তাঁর এই দশা?
ঘ. অচেনা লোকটি রাজার প্রাণ রক্ষার জন্য এগিয়ে না এলে কী হতো?
ঙ. কীভাবে রাজার প্রাণ রক্ষা পেল?
চ. কীভাবে লোকেরা নকল রানিকে বুঝে ফেলল?
ছ. রাজা কীভাবে তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করলেন?
জ. কাঞ্চনমালা এবং কাঁকনমালার চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা কর।

৪. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। ফাঁকা ঘরে ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

কান্না	হাসি	চেনা	অচেনা	ভালো	মন্দ	বড়	ছোট	আলো	আঁধার

ক. সন্তানের মৃত্যুতে তিনি .... ধরে রাখতে পারলেন না।

খ. .... লোকটির ফাঁদে পা দিয়ে সে তার সবকিছু হারিয়েছে।

গ. রাসেল বয়সে .... হলেও সংসারের অনেক কাজে মাকে সাহায্য করে।

ঘ. লোকটিকে আমি কোথায় যেন দেখেছি, খুব .... মনে হচ্ছে।

ঙ. বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় চারদিকে .... নেমে এলো।

৫. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য লিখি।

নিঝুম সুখ রাজপুত্র প্রতিজ্ঞা টনটন ময়ূর পদ্মলতা চিনচিন ঝলমল বাঁশি রাজ্য

৬. নিচের বাক্যাংশ ও বাক্যগুলো পড়ি।

ব্যথায় টনটন করা – খুব ব্যথা করা। সুচবিঁধা রাজার শরীর দিনরাত ব্যথায় টনটন করত।

খুশিতে ঝলমলিয়ে ওঠা – মন আনন্দে ভরে ওঠা। রাখাল বন্ধুর বাঁশির সুর শুনে রাজপুত্রের মন খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠত।

৭. গল্পে 'টনটন', 'থমথম' এ রকম শব্দ আছে। এই ধরনের আরও কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করে বাক্য লিখি (এখানে একটি দেখানো হলো)।

ভনভন – চারদিকে মাছি ভনভন করছে।

টনটন – ....

থৈথৈ – ....

রইরই – ....

কনকন – ....

ঝনঝন – ....

৮. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

সুখ	দুঃখ	মা-বাবার মনে কখনো দুঃখ দেওয়া উচিত নয়।
মায়া	....	....
স্বাদ	....	....
কষ্ট	....	....
নকল	....	....
রানি	....	....
রাজপুত্র	....	....
অসুন্দর	....	....
খুশি	....	....

৯. যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ তৈরি করে পড়ি ও লিখি।

হ্ম – ব্রহ্মপুত্র, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ক্ব – পরিপক্ব, ক্বচিৎ

ণ্ড – গণ্ডার, পাষণ্ড

ণ্ট – ঘণ্টা, কণ্টক

অবাক জলপান

সুকুমার রায়

পাত্রগণ : পথিক। ঝুড়িওয়ালা। বৃদ্ধ। ছোকরা। খোকা। মামা।

প্রথম দৃশ্য

রাজপথ

(ছাতা মাথায় এক পথিকের প্রবেশ। পিঠে লাঠির আগায় লোটা-বাঁধা পুঁটলি। উস্কখুস্ক চুল। শ্রান্ত চেহারা)

পথিক : নাঃ, একটু জল না পেলে আর চলছে না। সেই সকাল থেকে হেঁটে আসছি, এখনও প্রায় এক ঘণ্টার পথ বাকি। তেষ্টায় মগজের ঘিলু পর্যন্ত শুকিয়ে উঠল। কিন্তু জল চাই কার কাছে?

গেরস্তর বাড়ি, দুপুর রোদে দরজা এঁটে সব ঘুম দিচ্ছে, ডাকলে সাড়া দেয় না। বেশি চ্যাঁচাতে গেলে হয়তো লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবে। পথেও লোকজন দেখছিনে। – ওই একজন আসছে! ওকেই জিজ্ঞেস করা যাক।

[ঝুড়ি মাথায় এক ব্যক্তির প্রবেশ]

পথিক : মশাই, একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন?

ঝুড়িওয়ালা : জলপাই? জলপাই এখন কোথায় পাবেন? এ তো জলপাইয়ের সময় নয়। কাঁচা আম চান তো দিতে পারি –

পথিক : না না, আমি তা বলিনি –

ঝুড়িওয়ালা : না, কাঁচা আম আপনি বলেননি, কিন্তু জলপাই চাচ্ছিলেন কিনা, তা তো আর এখন পাওয়া যাবে না, তাই বলছিলুম –

পথিক : না হে, আমি জলপাই চাচ্ছিনে –

ঝুড়িওয়ালা : চাচ্ছেন না তো, 'কোথায় পাব' 'কোথায় পাব' কচ্ছেন কেন? খামাখা এরকম করবার মানে কী?

পথিক : আপনি ভুল বুঝছেন– আমি জল চাচ্ছিলাম–

ঝুড়িওয়ালা : জল চাচ্ছেন তো 'জল' বললেই হয়– 'জলপাই' বলবার দরকার কী? জল আর জলপাই কি এক হলো? আলু আর আলুবোখারা কি সমান? মাছও যা আর মাছরাঙাও তাই? বরকে কি আপনি বরকন্দাজ বলেন? চাল কিনতে গিয়ে কি চালতার খোঁজ করেন?

পথিক : ঘাট হয়েছে মশাই। আপনার সঙ্গে কথা বলাই আমার অন্যায় হয়েছে।

ঝুড়িওয়ালা : অন্যায় তো হয়েছেই। দেখছেন ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছি– তবে জল চাচ্ছেন কেন? ঝুড়িতে করে কি জল নেয়? লোকের সঙ্গে কথা কইতে গেলে একটু বিবেচনা করে বলতে হয়।

[ঝুড়িওয়ালার প্রস্থান]

পথিক : দেখলে! কী কথায় কী বানিয়ে ফেলল! যাক, ঐ বুড়ো আসছে, ওকে একবার বলে দেখি।

[লাঠি হাতে, চটি পায়ে, চাদর গায়ে এক বৃদ্ধের প্রবেশ]

বৃদ্ধ : কে ও? গোপলা নাকি?

পথিক : আজ্ঞে না, আমি পুবগাঁয়ের লোক – একটু জলের খোঁজ কচ্ছিলুম–

বৃদ্ধ : বল কিহে? পুবগাঁও ছেড়ে এখেনে এয়েছ জলের খোঁজ করতে?–হাঃ, হাঃ, হাঃ। তা, যাই বল বাপু, অমন জল কিন্তু কোথাও পাবে না। খাসা জল, তোফা জল, চমৎকার জল।

পথিক : আজ্ঞে হাঁ, সেই সকাল থেকে হাঁটতে হাঁটতে বেজায় তেষ্টা পেয়ে গেছে।

বৃদ্ধ : তা ত পাবেই। ভালো জল যদি হয়, তা দেখলে তেষ্টা পায়, নাম করলে তেষ্টা পায়, ভাবতে গেলে তেষ্টা পায়। তেমন জল ত খাওনি কখনো! বলি ঘুমড়ির জল খেয়েছ কোনোদিন?

পথিক : আজ্ঞে না, তা খাইনি—

বৃদ্ধ : খাওনি? অ্যাঃ! ঘুমড়ি হচ্ছে আমার মামাবাড়ি—আদত জলের জায়গা। সেখানকার যে জল, সে কি বলব তোমায়? কত জল খেলাম—কলের জল, নদীর জল, ঝরনার জল, পুকুরের জল—কিন্তু মামাবাড়ির কুয়োর যে জল, অমনটি আর কোথাও খেলাম না। ঠিক যেন চিনির পানা, ঠিক যেন ক্যাওড়া-দেওয়া সরবৎ!

পথিক : তা মশাই, আপনার জল আপনি মাথায় করে রাখুন—আপাতত এখন এই তেষ্টার সময়, যা হয় একটু জল আমার গলায় পড়লেই চলবে—

বৃদ্ধ : তাহলে বাপু তোমার গাঁয়ে বসে জল খেলেই ত পারতে? পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটে জল খেতে আসবার দরকার কি ছিল? 'যা হয় একটা হলেই হল' ও আবার কি রকম কথা? আর অমন তাচ্ছিল্য করে বলবারই বা দরকার কি? আমাদের জল পছন্দ না হয়, খেওনা—ব্যস্। গায়ে পড়ে নিন্দে করবার দরকার কি? আমি ওরকম ভালোবাসিনে। হ্যাঃ—

[রাগে গজগজ করিতে করিতে বৃদ্ধের প্রস্থান]

[পাশের বাড়ির জানালা খুলিয়া এক বৃদ্ধের হাসিমুখ বাহিরকরণ]

বৃদ্ধ : কী হে? এত তর্কাতর্কি কিসের?

পথিক : আজ্ঞে না, তর্ক নয়। আমি জল চাচ্ছিলুম, তা উনি সে কথা কানেই নেন না—কেবলই সাত-পাঁচ গপ্‌পো করতে লেগেছেন। তাই বলতে গেলুম তো রেগেমেগে অস্থির।

বৃদ্ধ : আরে দূর দূর। তুমিও যেমন! জিজ্ঞেস করবার আর লোক পাওনি? ও হতভাগা জানেই বা কী আর বলবেই বা কী? ওর যে দাদা আছে, খালিসপুরে চাকরি করে। সেটা তো একটা আস্ত গাধা। ও মুখ্যুটা কী বলল তোমায়?

পথিক : কী জানি মশাই—জলের কথা বলতেই কুয়োর জল, নদীর জল, পুকুরের জল, কলের জল, মামাবাড়ির জল বলে পাঁচ রকম ফর্দ শুনিয়ে দিলে—

বৃদ্ধ : হুঁঃ—ভাবলে খুব বাহাদুরি করেছি। তোমায় বোকামতো দেখে খুব চাল চেলে নিয়েছে। ভারি তো ফর্দ করেছেন, আমি লিখে দিতে পারি, ও যদি পাঁচটা জল বলে থাকে তো আমি এক্ষুণি পঁচিশটা বলে দেব—

পথিক : আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আমি বলছিলুম কি একটু খাবার জল–

বৃদ্ধ : কী বলছ? বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা শুনে যাও। বিষ্টির জল, ডাবের জল, নাকের জল, চোখের জল, জিবের জল, হুঁকোর জল, ফটিক জল, রোদে ঘেমে জ–ল, আহ্লাদে গলে জ–ল, গায়ের রক্ত জ–ল, বুঝিয়ে দিলে যেন জ–ল– কটা হয়? গোনোনি বুঝি?

পথিক : না মশাই, গুনিনি–আমার খেয়েদেয়ে কাজ নেই–

বৃদ্ধ : তোমার কাজ না থাকলেও আমার কাজ থাকতে পারে তো? যাও, যাও, মেলা বকিয়ো না–একেবারে অপদার্থের একশেষ। [বৃদ্ধের সশব্দে জানালা বন্ধকরণ]

[নেপথ্যে বাড়ির ভিতরে বালকের পাঠ]

[পৃথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল।
সমুদ্রের জল লবণাক্ত, অতি বিস্বাদ।]

পথিক : ওহে খোকা! এদিকে শুনে যাও তো?

[রুক্ষমূর্তি, মাথায় টাক, লম্বা দাড়ি খোকার মামা বাড়ি হইতে বাহির হইলেন]

মামা : কে হে? পড়ার সময় ডাকাডাকি করতে এয়েছ? – (পথিককে দেখিয়া) ও! আমি মনে করেছিলুম পাড়ার কোনও ছোকরা বুঝি! আপনার কী দরকার?

পথিক : আজ্ঞে, জলতেষ্টায় বড় কষ্ট পাচ্ছি–তা একটু জলের খবর কেউ বলতে পারলে না।

[মামার তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা খুলিয়া দেওয়া]

মামা : কেউ বলতে পারলে না? আসুন, আসুন, কী খবর চান, কী জানতে চান, বলুন দেখি? সব আমায় জিজ্ঞেস করুন, আমি বলে দিচ্ছি।

[পথিককে মামার ঘরে টানিয়া নেওয়া]

দ্বিতীয় দৃশ্য

ঘরের ভিতর

[ঘর নানা রকম যন্ত্র, নকশা, রাশি-রাশি বই ইত্যাদিতে সজ্জিত]

মামা : কী বলছিলেন? জলের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন না?

পথিক : আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই সকাল থেকে হাঁটতে হাঁটতে আসছি!

মামা : আ হা হা! কী উৎসাহ, কী আগ্রহ! শুনেও সুখ হয়। এরকম জানবার আকাঙ্ক্ষা ক-জনের আছে, বলুন তো? বসুন! বসুন! (কতকগুলি ছবি, বই আর এক টুকরো খড়ি বাহির করিয়া) জলের কথা জানতে গেলে প্রথমে জানা দরকার, জল কাকে বলে, জলের কী গুণ –

পথিক : আজ্ঞে, একটু খাবার জল যদি –

মামা : আসছে – ব্যস্ত হবেন না। একে একে সব কথা আসবে। জল হচ্ছে দুইভাগ হাইড্রোজেন আর একভাগ অক্সিজেন।

পথিক : এই মাটি করেছে!

মামা : বুঝলেন? রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জলকে বিশ্লেষণ করলে হয়–হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন। আর হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ হলেই, হবে জল! শুনছেন তো?

পথিক : দেখুন মশাই! কী করে যে কথাটা আপনাদের মাথায় ঢোকাব তা তো ভেবে পাইনে। বলি, বারবার করে যে বলছি – তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, সেটা তো কেউ কানে নিচ্ছেন না দেখি। একটা লোক তেষ্টায় জল জল করছে, তবু জল খেতে পায় না, এরকম কোথাও শুনেছেন?

মামা : শুনেছি বইকি, চোখে দেখেছি। বদ্যিনাথকে কুকুরে কামড়াল, বদ্যিনাথের হলো হাইড্রোফোবিয়া – যাকে বলে জলাতঙ্ক। আর জল খেতে পারে না – যেই জল খেতে যায় অমনি গলায় খিঁচ ধরে। মহা মুশকিল।

পথিক : নাঃ–এদের সঙ্গে পেরে ওঠা গেল না – কেনই মরতে এসেছিলাম এখানে? বলি মশাই, আপনার এখানে নোংরা জল আর দুর্গন্ধ জল ছাড়া ভালো খাঁটি জল কিছু নেই?

মামা : আছে বইকি! এই দেখুন না বোতল-ভরা খাঁটি টাটকা ডিস্টিল ওয়াটার–যাকে বলে পরিস্রুত জল।

[বড় সবুজ একটি বোতল আনিয়া মামা পথিককে দেখাইলেন]

পথিক : (ব্যস্ত হইয়া) এ জল কি খায়?

মামা : না, ও জল খায় না, ওতে তো স্বাদ নেই– একেবারে বোবা জল কিনা, এইমাত্র তৈরি করে আনল–এখনও গরম রয়েছে।

[পথিকের হতাশ ভাব]

তারপর যা বলছিলুম শুনুন– এই যে দেখছেন গন্ধওয়ালা নোংরা জল–এর মধ্যে দেখুন এই গোলাপি জল ঢেলে দিলুম– ব্যস, গোলাপি রং উড়ে সাদা হয়ে গেল। দেখলেন তো?

পথিক : না মশাই, কিচ্ছু দেখিনি, কিচ্ছু বুঝতে পারিনি, কিচ্ছু মানি না ও কিচ্ছু বিশ্বাস করি না।

মামা : কী বললেন। আমার কথা বিশ্বাস করেন না?

পথিক : না, করি না। আমি যা চাই, তা যতক্ষণ দেখাতে না পারবেন, ততক্ষণ কিচ্ছু শুনব না, কিচ্ছু বিশ্বাস করব না।

মামা : বটে, কোনটা দেখতে চান একবার বলুন দেখি– আমি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি।

পথিক : তা হলে দেখান দেখি। সাদা, খাঁটি চমৎকার এক গেলাস খাবার জল নিয়ে দেখান দেখি। যাতে গন্ধ পোকা নেই, কলেরার পোকা নেই, ময়লা-টয়লা কিছু নেই, তা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখান দেখি। খুব বড় এক গেলাস ভর্তি জল নিয়ে দেখান তো!

মামা : এক্ষুণি দেখিয়ে দিচ্ছি– ওরে ট্যাপা, দৌড়ে আমার কুঁজো থেকে এক গেলাস জল নিয়ে আয় তো।

[পাশের ঘরে দুপদাপ শব্দে খোকার দৌড়]

নিয়ে আসুক, তারপর দেখিয়ে দিচ্ছি। ওই জলে কী রকম হয়, আর নোংরা জলে কী রকম তফাত হয়, আমি সব এক্সপেরিমেন্ট করে দেখিয়ে দিচ্ছি।

[জল লইয়া ট্যাপার প্রবেশ]

এই খানে রাখ।

[জল রাখিবামাত্র পথিকের আক্রমণ—মামার হাত হইতে জল কাড়িয়া এক নিঃশ্বাসে চুমুক দিয়া শেষ করা]

পথিক : আঃ! বাঁচা গেল!

মামা : (চটিয়া) এটা কী রকম হলো মশাই?

পথিক : পরীক্ষা হলো– এক্সপেরিমেন্ট। এবার আপনি নোংরা জলটা একবার খেয়ে দেখান তো, কীরকম হয়?

মামা : (ভীষণ রাগিয়া) কী বললেন?

পথিক : আচ্ছা থাক, এখন নাই বা খেলেন – পরে খাবেন। আর গাঁয়ের মধ্যে আপনার মতো আনকোরা পাগল আর যতগুলো আছে, সবকটাকে খানিকটা করে খাইয়ে দেবেন। তারপর খাটিয়া তুলবার দরকার হলে আমায় খবর দেবেন – আমি খুশি হয়ে ছুটে আসব, হতভাগা জোচ্চোর কোথাকার।

[পথিকের দ্রুত প্রস্থান]

[পাশের গলিতে সুর করিয়া হাঁকিতে লাগিল – 'অবাক জলপান']

[অংশবিশেষ]

অনুশীলনী

১. নাটিকাটির মূলভাব জেনে নিই।

সুকুমার রায়ের ‘অবাক জলপান’ একটি নাটিকা। ছোট্ট নাটককে নাটিকা বলে। এতে একটি গল্প বলা হয়েছে। ‘অবাক জলপান’ নাটিকার কাহিনি হচ্ছে–ভীষণ তৃষ্ণার্ত একটি লোক তেষ্টায় নানান জনের কাছে গিয়ে জল চাইছে, কিন্তু কেউ তাকে জল দিচ্ছে না। বরং তার কথা বলার মধ্যে নানারকম খুঁত ধরছে। শেষ পর্যন্ত বেশ বুদ্ধি খাটিয়ে ফন্দি এঁটে এক বিজ্ঞানীর নিকট থেকে সে জল আদায় করল। অনেক সময় আমরা অপরের কথা বুঝতে ভুল করি। এই নাটিকায় তা মজা করে দেখানো হয়েছে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

গেরস্ত বরকন্দাজ তেষ্টা খাটিয়া এক্সপেরিমেন্ট রুক্ষমূর্তি

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

গেরস্ত	বরকন্দাজ	এক্সপেরিমেন্ট	তেষ্টায়	রুক্ষমূর্তি	খাটিয়ার

ক. .... বাড়ি, দুপুর রোদে দরজা এঁটে সব ঘুম দিচ্ছে।

খ. বরকে কি আপনি .... বলেন?

গ. একটা লোক .... জল জল করছে, তবু জল খেতে পায় না।

ঘ. পথিক ক্লান্ত হয়ে অবশেষে .... ওপর বসে পড়ল।

ঙ. নোংরা জলের ভিতর কী আছে তা .... করে বলা যাবে।

চ. .... লোকটিকে দেখলেই ভয় লাগে।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. ‘বোবা জল’ বলতে কী বোঝায়?

খ. ‘জলাতঙ্ক’ কাকে বলে?

গ. জলের তেষ্টায় পথিকের মন ও শরীরের অবস্থা কী হয়েছিল? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. মনে করো এই পথিকের সঙ্গে তুমি কথা বলছ। তোমাদের দুজনের কথোপকথন কেমন হতে পারে তা নিজের ভাষায় লেখো।

ঙ. পথিককে এক বৃদ্ধ কত রকম জলের কথা শুনিয়েছিল? নামগুলো লেখো।

চ. তুমি তোমার সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে ইচ্ছেমতো একটি নাটিকা লেখো।

৫. কর্ম-অনুশীলন

শিক্ষকের সহায়তায় নাটিকাটি শ্রেণিকক্ষে অভিনয় করি।

কবি-পরিচিতি

সুকুমার রায়

শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায় ৩০শে অক্টোবর ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছোটদের জন্য হাসির গল্প ও কবিতা লিখেছেন। ‘আবোল-তাবোল’, ‘হ-য-ব-র-ল’, ‘পাগলা দাশু’, ‘বহুরূপী’, ‘খাইখাই’, ‘অবাক জলপান’ তাঁর অমর সৃষ্টি। তাঁর পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীও শিশুসাহিত্যিক ছিলেন, আর পুত্র সত্যজিৎ রায় বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক। তিনিও শিশু-কিশোরদের জন্য প্রচুর লিখেছেন। ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯২৩ সালে সুকুমার রায় মৃত্যুবরণ করেন।

ঘাসফুল

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

আমরা ঘাসের ছোট ছোট ফুল
হাওয়াতে দোলাই মাথা,
তুলো না মোদের দলো না পায়ে
ছিঁড় না নরম পাতা।

শুধু দেখ আর খুশি হও মনে
সূর্যের সাথে হাসির কিরণে
কেমন আমরা হেসে উঠি আর
দুলে দুলে নাড়ি মাথা।

ধরার বুকে স্নেহ-কণাগুলি
ঘাস হয়ে ফুটে ওঠে।
মোরা তারই লাল নীল সাদা হাসি
রূপকথা নীল আকাশের বাঁশি–
শুনি আর দুলি বাতাসে
যখন তারারা ফোটে।

অনুশীলনী

১. কবিতার মূলভাব জেনে নিই।

ঘাসফুল যে কী আনন্দে বেঁচে আছে, জীবনকে উপভোগ করছে, সে কথাই এখানে তারা নিজেরা বলছে। ফুল ছিঁড়ে, পায়ের নিচে পিষে ফেলে মানুষ যেন তাদের কষ্ট না দেয়–সেই মিনতি তারা করছে। গাছে ফুল ফুটলে তা দেখে আনন্দ পাওয়া চাই। ফুল ছেঁড়ার অর্থ ফুলকে মেরে ফেলা। গাছের যেমন প্রাণ আছে, ফুলেরও তেমনই প্রাণ আছে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

দোলাই   কিরণ   ধরা   তারারা   ফোটে   স্নেহ-কণা   রূপকথা

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

দোলায়	কিরণ	ধরার	তারারা	স্নেহ-কণা	রূপকথার	ফোটে

ক. ছোট ছোট ফুল হাওয়াতে .... মাথা।

খ. সকালে সূর্যের .... ততটা তীব্র হয় না।

গ. .... বুকের স্নেহ-কণাগুলি ঘাস হয়ে ফুটে ওঠে।

ঘ. আঁধার আকাশে .... মিটিমিটি করে চায়।

ঙ. ফুল গাছে ফুল .... ।

চ. .... বই পড়তে অনেক ভালো লাগে।

ছ. মা .... দিয়ে আমাদের ভরে রাখেন।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. হাওয়াতে কারা মাথা দোলাচ্ছে?

খ. ঘাসফুল আমাদের কাছে কী মিনতি করছে? কেন করছে?

গ. ঘাসফুল কার সাথে নিজেকে তুলনা করেছে? কীভাবে তুলনা করেছে?

ঘ. ফুল মানুষকে কীভাবে আনন্দ দেয়?

২০২৫

৫. কবিতাটি আবৃত্তি করি ও না দেখে লিখি।

৬. কর্ম-অনুশীলন।

ক. আমার প্রিয় ফুল সম্পর্কে একটি রচনা লিখি।
ফুলের নাম:
ফুলের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা:
ব্যবহার:
কেন প্রিয় ফুল:

খ. পাঠ্যবইয়ের বাইরের কোনো কবিতা বা ছড়া পড়ে তা শ্রেণিকক্ষে আবৃত্তি করি।

কবি-পরিচিতি

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ১৯১১ সালে পাবনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রখ্যাত কবি ও গায়ক। তিনি অনেক উদ্দীপনামূলক দেশপ্রেমের গান লিখে বিখ্যাত হয়েছেন। সংগীতের শিক্ষক হিসেবেও তিনি খ্যাতিমান। তিনি ১৯৭৭ সালের ২৬শে অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।

আমরা তোমাদের ভুলব না

যাঁরা ন্যায়ের পথে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা যান, তাঁদের আমরা শহিদ বলি। এ দেশের জন্য এবং এ দেশের মানুষের জন্য বহু কাল ধরে বহু মানুষ প্রাণ দিয়েছেন, শহিদ হয়েছেন।

শহিদ মীর নিসার আলী তিতুমীর

আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে ইংরেজদের নির্যাতন থেকে এ দেশের কৃষককে বাঁচাতে গিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন তিতুমীর। ইংরেজদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তিনি বাঁশের কেল্লা বানিয়েছিলেন। সেই কেল্লায় তিনি তাঁর কৃষক সৈন্যদের সাথে নিয়ে যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়েছিলেন। আমরা তাঁকে কখনো ভুলব না।

শহিদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

প্রায় শত বছর আগে ইংরেজ শাসন থেকে এ দেশকে মুক্ত করতে যুদ্ধ করেছিলেন সূর্যসেন। যুদ্ধ করেছিলেন প্রীতিলতাসহ আরো অনেকে। সূর্যসেনকে আটক করার পর তাঁকে ফাঁসিতে ঝুঁলিয়ে হত্যা করা হয়। প্রীতিলতা আত্মাহুতি দেন। অনেক আন্দোলন শেষে ১৯৪৭ সালে ভারত আর পাকিস্তান স্বাধীন হয়। আমাদের পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ দেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। আমরা তাঁদের স্মরণ করব।

বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের শহিদদের কথা আমরা সবাই জানি – সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরো অনেক নাম। বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে তাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন। তাঁদের স্মরণ করেই আমাদের শহিদ মিনার তৈরি করা হয়েছে। প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারিতে আমরা তাঁদের স্মরণ করি।

শহিদ আমানুল্লাহ মোঃ আসাদুজ্জামান

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে পাকিস্তানের শাসক ছিলেন আইয়ুব খান। তার অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালে একটি গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল। সেই অভ্যুত্থানের একজন ছাত্রনেতা ছিলেন আসাদ। পুলিশ খুব কাছ থেকে তাঁকে গুলি করে হত্যা করেছিল। তাঁর নামকে স্মরণে রাখতে ঢাকায় রয়েছে

আসাদ গেট। মতিয়ুর নামের নবম শ্রেণির একজন শিক্ষার্থীকেও রাস্তায় গুলি করে হত্যা করা হয়। আনোয়ারা বেগম নামের একজন মা-ও নিহত হন। তিনি তখন ঘরের মধ্যে বসে তাঁর সন্তানকে খাবার খাওয়াচ্ছিলেন।

শহিদ মতিয়ুর রহমান মল্লিক

শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক

শহিদ ড. মুহম্মদ শামসুজ্জোহা

ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে আটক রেখে হত্যা করা হয় সার্জেন্ট জহুরুল হককে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের বাঁচাতে গিয়ে নিহত হন অধ্যাপক শামসুজ্জোহা। নিহত হন কৃষক-শ্রমিক আর খেটে-খাওয়া অনেক মানুষ। তাঁরা সবাই শহিদ। তাঁরা আমাদের স্মৃতিতে চিরদিন অমলিন থাকবেন।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ শহিদ হয়েছেন। তাঁদের কথা আমরা বইয়ে, কবিতায়, সিনেমায়, গানে ও ছবিতে নানাভাবে পাই। তাঁদের আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও এদেশে অন্যায়-অত্যাচার থামে না। তাই মানুষ প্রতিবাদ করে। শিক্ষার অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে ১৯৮৩ সালে শহিদ হন ছাত্রনেতা সেলিম-দেলোয়ারসহ আরো অনেকে। গণতন্ত্রের জন্য বুকে-পিঠে শ্লোগান লিখে ১৯৮৭

শহিদ নুর হোসেন

শহিদ ডা. শামসুল আলম খান মিলন

শহিদ নাজির উদ্দিন জেহাদ

সালে শহিদ হন নুর হোসেন। ১৯৯০ সালে নিহত হন ডাক্তার মিলন ও জেহাদ। তারপর গণঅভ্যুত্থান ঘটে। সারাদেশে অনেক মানুষ মারা যায়। তাঁরা সবাই শহিদ। আমরা তাঁদের কখনো ভুলব না।

এত ত্যাগের পরও এ দেশের মানুষ অধিকার পায় না, বৈষম্য কমে না। অধিকারের দাবি ও বৈষম্যের কথা বলতে গিয়ে এদেশের শিক্ষার্থীরা তাই ২০২৪ সালে আবার রাস্তায় নামে। সরকারি বাহিনী নির্মমভাবে সেই আন্দোলন দমন করতে চায়।

শহিদ আবু সাঈদ

পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রংপুরে ছাত্রনেতা আবু সাঈদ দুই হাত প্রসারিত করে দাঁড়ান। পুলিশ তাঁকে খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করে।

এতে আন্দোলন সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সারা দেশের মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। বিশাল এক গণঅভ্যুত্থানের সৃষ্টি হয়। ঢাকার উত্তরায় শিক্ষার্থী মীর মুগ্ধ আন্দোলনরত সবাইকে পানি বিতরণ করতে করতে নিহত হন। নিহত হন নাফিজ, নাফিসা, আনাসসহ অগণিত প্রাণ। মায়ের কোলের শিশু, বাবার সাথে খেলতে থাকা শিশু, রিকশাওয়ালা, শ্রমিক, কৃষক, ফেরিওয়ালা, চাকুরিজীবী, মা, পথচারী কেউ বাদ যায় না। সারা দেশে হত্যা করা হয় হাজারো মানুষকে। আহত হন অসংখ্য মানুষ। তাঁরা সবাই একটি বৈষম্যহীন বাংলাদেশের জন্য রক্ত দিয়েছেন। সবার অধিকার থাকবে এবং সবাই মিলেমিশে বাস করতে পারবে – এমন একটা দেশের জন্যই তাঁরা শহিদ হয়েছেন। আমরা তাঁদের কখনো ভুলব না।

শহিদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

আক্রমণ, কেল্লা, অভ্যুত্থান, ক্যান্টনমেন্ট, আন্দোলন, বৈষম্য

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ফাঁসিতে	কৃষককে	প্রসারিত	১৯৪৭	শহিদ মিনার

ক. তিতুমীর যুদ্ধ করেছিলেন এ দেশের .... বাঁচাতে।

খ. সূর্যসেনকে .... ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

গ. ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন হয় .... সালে।

ঘ. ভাষা শহিদদের স্মরণে তৈরি হয়েছে ....।

ঙ. পুলিশের গুলির মুখে আবু সাঈদ দুই হাত .... করে দাঁড়ান।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কাদের আমরা শহিদ বলি?

খ. ইংরেজদের বিরুদ্ধে দেশ বাঁচাতে কারা যুদ্ধ করেছিলেন?

গ. বায়ান্নোর ভাষা শহিদদের নাম লিখি।

ঘ. ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কে যা জানি তা লিখি।

ঙ. ২০২৪ সালের অভ্যুত্থানে সহস্র মানুষ জীবন দিয়েছেন কেন?

৪. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য তৈরি করি।

ন্যায় ....।

যুদ্ধ ....।

নির্মম .... ।

গণতন্ত্র .... ।

বৈষম্য .... ।

৫. ঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দিই।

ক. ১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলা কার অন্তর্ভুক্ত হয়?

১. ভারতের   ২. পাকিস্তানের

৩. শ্রীলংকার   ৪. ভুটানের

খ. বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে পাকিস্তানের শাসক ছিলেন –

১. ইয়াহিয়া খান   ২. বেনজীর ভুট্টো

৩. আইয়ুব খান   ৪. খাজা নাজিমুদ্দিন

গ. ৬৯-এর অভ্যুত্থানে কোন ছাত্রনেতা শহিদ হন?

১. আসাদ   ২. জব্বার

৩. নুর হোসেন   ৪. মতিয়ুর

ঘ. বুকে পিঠে শ্লোগান লিখে নুর হোসেন শহিদ হন –

১. ১৯৯০ সালে   ২. ১৯৮৩ সালে

৩. ১৯৮৭ সালে   ৪. ২০০২ সালে

ঙ. আন্দোলনে পানি বিতরণ করতে করতে মীর মুগ্ধ শহিদ হন –

১. ঢাকার আজিমপুরে   ২. নরসিংদীর বেলাবোতে

৩. ঢাকার উত্তরায়   ৪. রংপুরের পার্কে

৬. পাঠে উল্লিখিত বীর শহিদদের একটি ধারাবাহিক তালিকা প্রস্তুত করি। শিক্ষককে দেখাই।

শিক্ষাগুরুর মর্যাদা

কাজী কাদের নওয়াজ
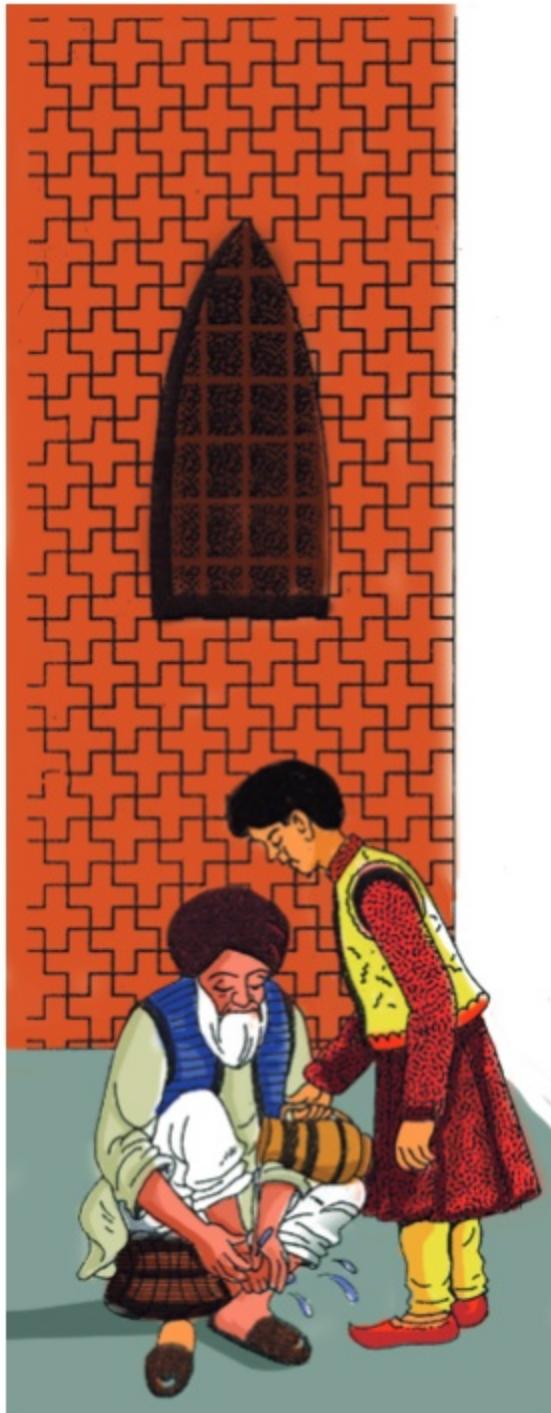
বাদশাহ আলমগীর–
কুমারে তাঁহার পড়াইত এক মৌলবি দিল্লির।
একদা প্রভাতে গিয়া
দেখেন বাদশাহ– শাহজাদা এক পাত্র হস্তে নিয়া
ঢালিতেছে বারি গুরুর চরণে
পুলকিত হৃদে আনত-নয়নে,
শিক্ষক শুধু নিজ হাত দিয়া নিজেরি পায়ের ধূলি
ধুয়ে-মুছে সব করিছেন সাফ সঞ্চারি অঙ্গুলি।

শিক্ষক মৌলবি
ভাবিলেন, আজি নিস্তার নাহি, যায় বুঝি তাঁর সবি।
দিল্লিপতির পুত্রের করে
লইয়াছে পানি চরণের পরে,
স্পর্ধার কাজ, হেন অপরাধ কে করেছে—কোন কালে !
ভাবিতে ভাবিতে চিন্তার রেখা দেখা দিল তাঁর ভালে।

হঠাৎ কী ভাবি উঠি
কহিলেন, আমি ভয় করি নাক, যায় যাবে শির টুটি,
শিক্ষক আমি শ্রেষ্ঠ সবার
দিল্লির পতি সে তো কোন ছার,
ভয় করি নাক, ধারি নাক ধার, মনে আছে মোর বল,
বাদশাহ শুধালে শাস্ত্রের কথা শুনাব অনর্গল।

যায় যাবে প্রাণ তাহে,
প্রাণের চেয়েও মান বড়ো, আমি শুনাব শাহানশাহে।

তার পরদিন প্রাতে
বাদশাহর দূত শিক্ষকে ডেকে নিয়ে গেল কেল্লাতে।
খাস কামরাতে যবে
শিক্ষকে ডাকি বাদশাহ কহেন, 'শুনুন জনাব তবে,
পুত্র আমার আপনার কাছে
সৌজন্য কি কিছু শিখিয়াছে?
বরং শিখেছে বেয়াদবি আর গুরুজনে অবহেলা,
নহিলে সেদিন দেখিলাম যাহা স্বয়ং সকাল বেলা।'

শিক্ষকে কন– 'জাঁহাপনা, আমি বুঝিতে পারিনি, হায়,
কী কথা বলিতে আজিকে আমায় ডেকেছেন নিরালায়?'
বাদশাহ কহেন, 'সে দিন প্রভাতে
দেখিলাম আমি দাঁড়ায়ে তফাতে
নিজ হাতে যবে চরণ আপনি করেন প্রক্ষালন,
পুত্র আমার জল ঢালি শুধু ভিজাইছে ও চরণ।
নিজ হাতখানি আপনার পায়ে বুলাইয়া সযতনে
ধুয়ে দিল নাক কেন সে চরণ, বড় ব্যথা পাই মনে।'

উচ্ছ্বাস ভরে শিক্ষকে আজি দাঁড়ায়ে সগৌরবে,
কুর্নিশ করি বাদশাহে তবে কহেন উচ্চরবে—
'আজ হতে চির উন্নত হলো শিক্ষাগুরুর শির
সত্যই তুমি মহান উদার বাদশাহ আলমগীর।'

অনুশীলনী

১. কবিতার মূলভাব জেনে নিই।

'শিক্ষাগুরুর মর্যাদা' কবিতায় শিক্ষকের মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কবিতায় শিক্ষক বাদশাহ আলমগীরের ছেলের দ্বারা পায়ে পানি ঢেলে নিয়েছিলেন। কবিতায় একটি ঘটনার সূত্রে কবি তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন। বাদশা আলমগীর একদিন দেখেন তাঁর পুত্র শিক্ষকের পায়ে পানি ঢেলে দিচ্ছে আর শিক্ষক ওজু করছেন। বাদশাহ আলমগীর এতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন তাঁর সন্তান পানি ঢেলে নিজ হাতে শিক্ষকের পা ধুয়ে দেবেন। তবেই না তাঁর সন্তান নৈতিকতা ও মূল্যবোধ নিয়ে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে। কবিতার মাধ্যমে আমরা উপলব্ধি করতে পারি, শিক্ষা হলো একটি জাতির মেরুদণ্ড, আর শিক্ষক হলেন কাণ্ডারি। তাই সমাজে শিক্ষকের মর্যাদা সবার উপরে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

কুমার শাহজাদা বারি চরণ শির শাহানশাহ প্রক্ষালন কুর্নিশ

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

কুমার	বারি	চরণ	শির	শাহানশাহ	কুর্নিশ

ক. পিতার .... হাত রেখে পুত্র দোয়া চাইল।
খ. বর্ষাকালে প্রবল .... বর্ষণ হয়।
গ. আগের দিনে হাতি-ঘোড়া চড়ে .... শিকারে যেতেন।
ঘ. উজির বাদশাহকে .... করলেন।
ঙ. .... আলমগীর ছিলেন একজন মহৎপ্রাণ শাসক।
চ. অন্যায়ের কাছে কখনো .... নত করব না।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. বাদশাহ আলমগীরের পুত্রকে কে পড়াতেন?
খ. একদিন সকালে বাদশাহ কী দেখতে পেলেন?
গ. বাদশাহকে দেখে শিক্ষক প্রথমে কী ভাবলেন?
ঘ. 'প্রাণের চেয়েও মান বড়'— শিক্ষক এ কথা বললেন কেন?

ঙ. বাদশাহ আলমগীর শিক্ষককে প্রথমে কী বললেন?

চ. শিক্ষক কী বলে বাদশাহর সুনাম করলেন?

৫. নিচের কথাগুলো বুঝে নিই।

শিক্ষকে ডাকি বাদশাহ কহেন, 'শুনুন জনাব তবে,
পুত্র আমার আপনার কাছে
সৌজন্য কি কিছু শিখিয়াছে?
বরং শিখেছে বেয়াদবি আর গুরুজনে অবহেলা,
নহিলে সেদিন দেখিলাম যাহা স্বয়ং সকাল বেলা।'

৬. ক্ষ, স্ব, স্ম স্ত্র – প্রত্যেকটি যুক্তবর্ণ ব্যবহার করে তিনটি করে শব্দ লিখি। যেমন–

ক্ষ = ক্ + ষ — ক্ষয়, শিক্ষা, সক্ষম
স্ব = স্ + ব —
স্ম = স্ + ম —
স্ত্র = স্ + ত্ + র —

৭. বিপরীত শব্দগুলো ঠিকমতো সাজাই।

বড়ো	অপযশ
মান	অবনত
যশ	বিকাল
বিষাদ	অপমান
উন্নত	ছোটো
সকাল	হর্ষ

কবি-পরিচিতি

কাজী কাদের নওয়াজ

কবি কাজী কাদের নওয়াজ ১৯০৯ সালের ১৫ই জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার তালিবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স ও বিটি পাশ করেন। তিনি চাকরি জীবনের প্রথমে ছিলেন সাব ইন্সপেক্টর, পরে বিভিন্ন স্কুলে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি নীতিকথা ও কাহিনিমূলক শিশুতোষ কবিতার জন্য খ্যাতি লাভ করেন। ১৯৮৩ সালের ৩রা জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ভাবুক ছেলেটি

ছেলেটি তেমন দুরন্ত নয়। বয়স দশ-এগারো হবে। পড়াশোনায় সে ভালো, খেলাধুলাও করে। তবে সময় পেলেই গাছ-গাছালি পর্যবেক্ষণ করে। রোদ-বৃষ্টির ব্যাপারটাও সে দেখে। আকাশে মেঘ ডাকে। বিদ্যুৎ চমকায়। বাজ পড়ে। কেন এমন হয়? অবাক বিস্ময়ে সে ভাবে। ঝড়ে গাছপালা ভেঙে গেলে বাবাকে প্রশ্ন করে।

– আচ্ছা বাবা, গাছ ভেঙে গেলে, ওদেরকে কাটলে ব্যথা পায় না?

ছেলের কথা শুনে মা হাসেন। বাবা কিন্তু হাসলেও ছেলের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেন। ওর বাবা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আগে স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন।

ছেলেটির বাবার বাড়ি বিক্রমপুরের রাঢ়িখাল গ্রামে। তবে তার জন্ম ময়মনসিংহে– ১৮৫৮ সালের ৩০শে নভেম্বর। ওর পড়াশোনায় হাতেখড়ি হয়েছিল বাড়িতেই। তারপর ময়মনসিংহে স্কুল শিক্ষার ধাপ শেষ করে ভর্তি হয় কলকাতায়। ১৮৭৪ সালে সে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করে। ১৮৭৮ সালে সে এফএ পরীক্ষাতেও কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়। তারপর ১৮৮০ সালে বিজ্ঞান শাখায় বি এস সি পাস করে বিলেতে যায় ডাক্তারি পড়তে।

সেই ছেলেটিই বড় হয়ে বাঙালি বিজ্ঞানী হিসেবে প্রথম জগৎ জোড়া খ্যাতি অর্জন করে। সেই ভাবুক ছেলেটিই পরবর্তীকালে হয়ে ওঠেন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু।

জগদীশচন্দ্র এক বছর ডাক্তারি পড়ার পর ১৮৮১ সালে ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখান থেকে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। ১৮৮৫ সালে দেশে ফিরে এসে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে যোগ দেন। তখন ভারতবর্ষ শাসন করত ইংরেজরা। এ সময় একজন ইংরেজ অধ্যাপক এদেশীয় একজন অধ্যাপকের চেয়ে অনেক বেশি বেতন পেতেন। জগদীশচন্দ্র অস্থায়ীভাবে চাকরি করছিলেন বলে তাঁর বেতন আরও এক ভাগ কেটে নেওয়া হয়। এর প্রতিবাদে তিনি দীর্ঘ তিন বছর বেতন না নিয়ে কর্তব্য পালন করেন। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার তাঁকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন। সকল বকেয়া পরিশোধ করে তাঁকে চাকরিতে স্থায়ী করা হয়।

ধীরে ধীরে তিনি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু হয়ে ওঠেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করে।

জগদীশচন্দ্র বসু

জগদীশচন্দ্র বসু নানা বিষয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনের মধ্যে অনেক মিল আছে। ১৮৯৫ সালে তিনি অতিক্ষুদ্র তরঙ্গসৃষ্টি আবিষ্কার করেন। কোনো তার ছাড়া তরঙ্গ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রেরণে সফলতা অর্জন করেন। তারই প্রয়োগ ঘটেছে আজকের বেতার, টেলিভিশন, রাডারসহ বিশ্বের অধিকাংশ তথ্যের আদান-প্রদান এবং মহাকাশ যোগাযোগের ক্ষেত্রে। কিন্তু জীবদ্দশায় তিনি তাঁর এই সাফল্যের স্বীকৃতি পাননি। তাঁর করা পরীক্ষণগুলো ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের চমকে দেয়। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা শুনে বিখ্যাত বিজ্ঞানী অলিভার লজ ও লর্ড কেলভিন তাঁকে বিলেতে অধ্যাপনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু দেশের কল্যাণের জন্যই তিনি নিজ দেশে ফিরে আসেন।

তাঁর আশ্চর্য সব আবিষ্কার দেখে বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছিলেন: জগদীশচন্দ্র বসু এতগুলো আবিষ্কার না করে যদি একটি আবিষ্কারও করতেন তবু তাঁর জন্য আমাদের মূর্তি স্থাপন করতে হতো।

জগদীশচন্দ্র বাংলা ভাষাও অনেক লিখেছেন, বিশেষ করে শিশুদের জন্য। অনেকের মতে, তাঁর লেখা 'নিরুদ্দেশের কাহিনি' বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি। এটি পরে 'পলাতক তুফান' নামে তাঁর 'অব্যক্ত' নামক বইয়ে ছাপা হয়।

১৯১৭ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'নাইট' উপাধি দেন। তাই উপাধিসহ তাঁর নাম হয় স্যার জগদীশচন্দ্র বসু। সে বছরই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বসু বিজ্ঞান মন্দির। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সেই বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণা পরিচালনা করেন। তিনি ক্রেসকোগ্রাফ নামের একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। এই যন্ত্রের মাধ্যমে তিনি সূক্ষ্মভাবে প্রমাণ করে দেখান যে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে উদ্ভিদ প্রাণীদের মতোই সাড়া দেয়।

স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ১৯৩৭ সালের ২৩শে নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর সফলতা বিজ্ঞানী গ্যালিলিও-নিউটনের সমকক্ষ ছিল। জগদীশচন্দ্র বসু বাংলাদেশের গৌরব। তিনি পৃথিবীকে দেখিয়েছেন বিজ্ঞানের নতুন পথ।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

পরীক্ষণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ এফএ বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি প্রবেশিকা

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

কল্পকাহিনি	আবিষ্কার	কল্যাণ	পাণ্ডিত্যপূর্ণ	দুরন্ত	
পদার্থবিজ্ঞানের	বিস্ময়ে	বাড়িতে	অতিক্ষুদ্র	কর্তব্য	প্রাণী জীবনের

ক. তাঁর .... বক্তৃতা শুনে তাঁকে অধ্যাপনা করার আমন্ত্রণ জানানো হয়।

খ. দেশের .... করার জন্যই তিনি নিজ দেশে ফিরে আসেন।

গ. জগদীশচন্দ্র বসুর আশ্চর্য সব .... দেখে আইনস্টাইন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

ঘ. জগদীশচন্দ্র বসুর 'নিরুদ্দেশের কাহিনি' বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম বৈজ্ঞানিক ....।

ঙ. ছেলেটি তেমন .... নয়।

চ. মেঘ ডেকে আকাশে বিদ্যুৎ চমকে বাজ পড়লে অবাক .... ভাবে।

ছ. ওর পড়াশোনার শুরু ....।

জ. প্রেসিডেন্সি কলেজে .... অধ্যাপক পদে যোগ দেন।

ঝ. প্রতিবাদে তিনি দীর্ঘ তিন বছর বেতন না নিয়ে .... পালন করেন।

ঞ. তিনি দেখিয়েছিলেন যে, উদ্ভিদ ও .... মধ্যে অনেক মিল আছে।

ট. তিনি .... তরঙ্গসৃষ্টি আবিষ্কার করেন।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি ও বলি।

ক. ভাবুক ছেলেটি আসলে কে ছিলেন?

খ. তিনি ছোটোবেলায় কী কী নিয়ে ভাবতেন?

গ. তিনি কবে, কোথা থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন?

ঘ. জগদীশচন্দ্র বসু কী যন্ত্র আবিষ্কার করেন? এটি দিয়ে তিনি কী প্রমাণ করেন?

ঙ. বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর সফলতাকে **কোন** কোন নামকরা বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?

চ. তাঁর সম্পর্কে আইনস্টাইন কী বলেছিলেন? কেন বলেছিলেন?

৫. কথাগুলো বুঝে নিই।

শিক্ষার ধাপ	–	প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় হলো একটার পর একটা শিক্ষার ধাপ।
বকেয়া পরিশোধ	–	কারো নিকট কোনো টাকা-পয়সা পাওনা থাকলে যদি সময়মতো দেওয়া না হয় তখন তা বকেয়া হয়ে যায়। পরে যদি আগের পাওনা দিয়ে দেওয়া হয় তবে তাকে বলে বকেয়া পরিশোধ।
অন্যতম	–	অনেকের মধ্যে একজনকে বলা হয় অন্যতম। কোনো কিছুকে বিশেষভাবে বোঝানোর জন্য 'অন্যতম' শব্দটি ব্যবহার করা যায়।
তথ্যের আদান-প্রদান	–	সংবাদ, প্রকৃত অবস্থা বা সত্যের আদান-প্রদান। আজকের দিনে লিখে, ছাপিয়ে অথবা বেতার, টেলিভিশন, ফোন, ইন্টারনেটের সাহায্যে যত কিছু পাওয়া যায়, পাঠানো যায় তার সবই তথ্যের আদান-প্রদান।
নাইট উপাধি	–	নাইট উপাধি ব্রিটিশ রাজা বা রানির দেওয়া অত্যন্ত সম্মানজনক উপাধি। এ উপাধি যাঁরা পান তাঁদের 'স্যার' বলে সম্বোধন করা হয়।

৬. কর্ম-অনুশীলন।

'বিজ্ঞান শিক্ষাই সভ্যতা বিনির্মাণের একমাত্র উপায়।' – বিষয়টি নিয়ে শিক্ষকের সহায়তায় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি।

৭. আমার জানা যেকোনো একজন বিজ্ঞানী সম্পর্কে ১০টি বাক্য লিখি।

দুই তীরে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি ভালোবাসি আমার
নদীর বালুচর,
শরৎকালে যে নির্জনে
চকাচকির ঘর।

যেথায় ফুটে কাশ
তটের চারি পাশ,
শীতের দিনে বিদেশি সব
হাঁসের বসবাস।

কাছ্‌পেরা ধীরে
রৌদ্র পোহায় তীরে,
দু-একখানি জেলের ডিঙি
সন্ধেবেলায় ভিড়ে।

তুমি ভালোবাস তোমার
ওই ও পারের বন,
যেথায় গাঁথা ঘনচ্ছায়া
পাতার আচ্ছাদন।

যেথায় বাঁকা গলি
নদীতে যায় চলি,
দুই ধারে তার বেণুবনের
শাখায় গলাগলি।

সকাল-সন্ধেবেলা
ঘাটে বধূর মেলা
ছেলের দলে ঘাটের জলে
ভাসে ভাসায় ভেলা।

(অংশবিশেষ)

অনুশীলনী

১. কবিতার মূলভাব জেনে নিই।

একটি নদী, তার দুই তীরে দুজন মানুষ বাস করে। একজন ভালোবাসে তার নদীর বালুচর, শরৎকালে চকাচকিরা যেখানে ঘর বাঁধে। এর তীরে তীরে ফুটে থাকে কাশফুল। শীতের সময় হাঁসেরা এসে ভিড় করে, কচ্ছপ রোদ পোহায়। সন্ধ্যায় জেলের ডিঙি এসে ভিড়ে। অন্যজন ভালোবাসে বন, যার আছে ঘন ছায়া। সেখান থেকে একটা রাস্তা এসে মিশেছে নদীতে। নদীর ঘাটে বধূরা আসে, ছেলেরা জলে ভেলা ভাসায়। এই কবিতায় একটি নদী দুই তীরের মানুষকে সুন্দর করে মিলিয়ে দিয়েছে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

নির্জন   চকাচকি   তট   ডিঙি   আচ্ছাদন   বেণুবন

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

চকাচকি	আচ্ছাদন	তটে	বেণুবন	নির্জন	ডিঙি

ক. এলাকাটি এত .... যে গা ছমছম করে।

খ. নদীর ধারে .... দল বেঁধে উড়ে বেড়ায়।

গ. গ্রামের ছোট ছোট নদীগুলো মানুষ .... করে পার হয়।

ঘ. নদীর দু .... প্রতিবছর মেলা বসে।

ঙ. নদী তীরের বটগাছটি বর্ষাকালে মানুষ .... হিসাবে ব্যবহার করে।

চ. নদীর ধারে গজিয়ে ওঠা .... বাতাসে দুলতে থাকে।

৪. নিচের কথাগুলো বুঝে নিই।

তুমি ভালোবাস তোমার
ওই ও পারের বন,
যেথায় গাঁথা ঘনচ্ছায়া
পাতার আচ্ছাদন।

৫. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. নদীর বালুচরে কী ঘটে?

খ. দুই তীরে দুজন মানুষের ভালোলাগার জিনিসগুলো কী কী?

গ. ঘাটে বধূর মেলা বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ঘ. 'দুই তীরে' কবিতায় ওই পারের বনটি কেমন?

ঙ. সকাল-সন্ধ্যায় ছেলের দল কী করে?

৬. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

৭. কর্ম-অনুশীলন।

শূন্যস্থানে কথা বসিয়ে একটি কবিতা বা ছড়া লেখার চেষ্টা করি।

.... মাস,

.... বাঁশ।

.... চর,

.... ঘর।

.... মন,

.... বন।
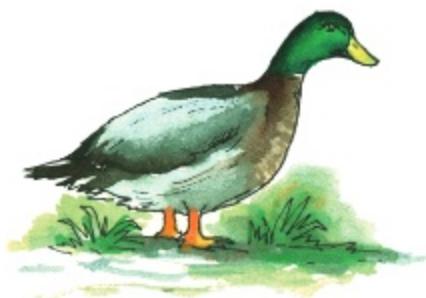
কবি-পরিচিতি
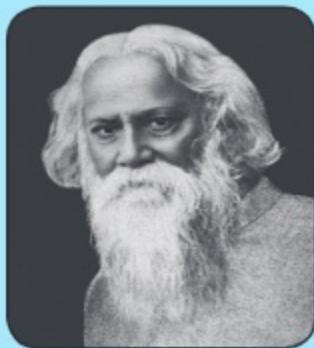
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে, ১২৬৮ বাংলা সনের ২৫শে বৈশাখ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শুধু কবি নন, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, দার্শনিক, গীতিকার, সুরস্রষ্টা, চিত্রশিল্পী, সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদ। তাঁর রচনা ভাণ্ডার বিশাল। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই আগস্ট, ১৩৪৮ বাংলা সনের ২২শে শ্রাবণ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
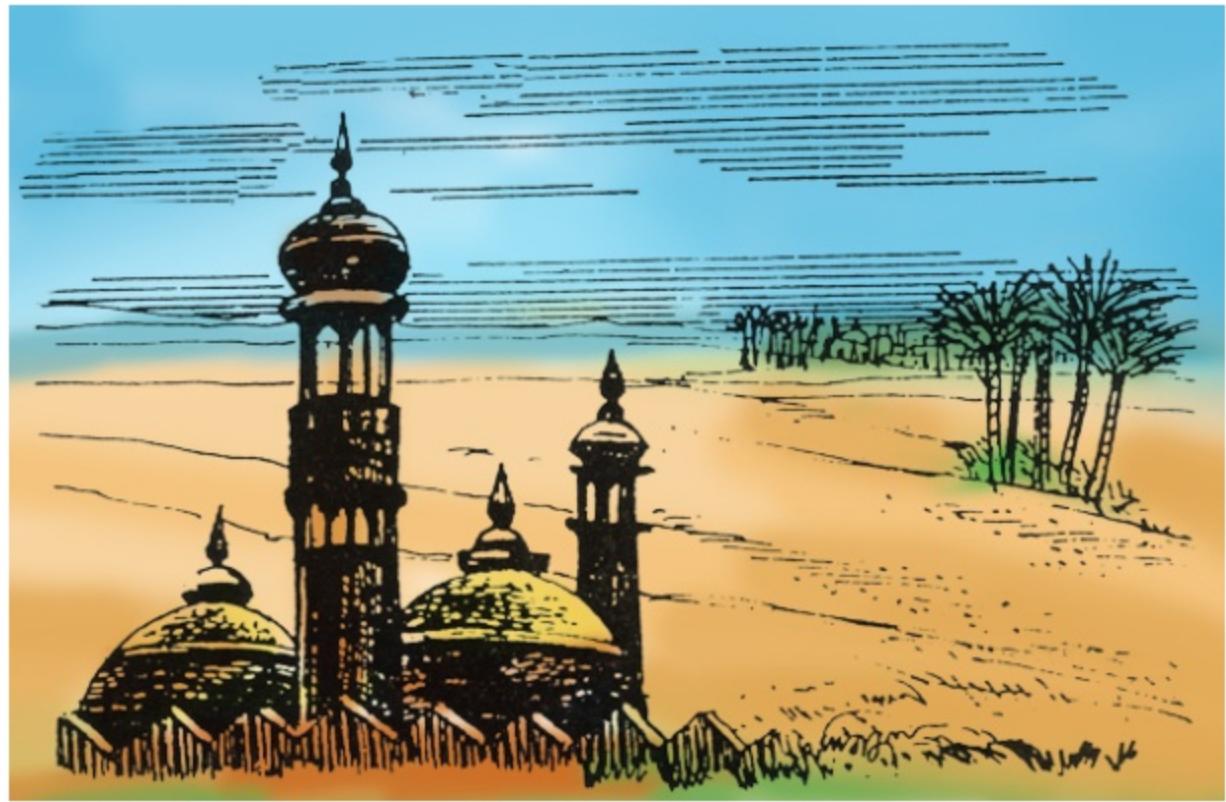
বিদায় হজ

হিজরি দশম সাল। আরবদেশের অনেকেই তখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন সত্য, ন্যায় ও মানবতার বাণী। ইসলামের এ বাণী তখন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

দশম হিজরির হজের সময় এসে গেল। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) অন্তরের গভীরে কাবার আহ্বান অনুভব করলেন। তিনি স্থির করলেন, সাহাবিদের সঙ্গে নিয়ে হজ পালন করবেন। এই সংবাদ চারদিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল।

নবিজি (স)–এর কাছে সমবেত হলেন হাজার হাজার মানুষ। তাঁদের ইচ্ছা নবিজি (স)–এর সঙ্গে হজ পালন করবেন। যিলকাদ মাসের শেষ দিকে মহানবি (স)–এর সঙ্গে তাঁরা মক্কার পথে যাত্রা করলেন। যাঁরা তাঁকে কখনও দেখেননি তাঁরাও এই মহামানবকে একবার দেখার জন্য কাবা শরিফে এলেন।

২০২৫

আরবদেশের নানা স্থান থেকে প্রায় দুই লক্ষ মানুষ হজ পালন করতে এলেন। আরাফাতের ময়দানে এত বিপুল সংখ্যক মানুষ দেখে মহানবি (স)–এর মন আনন্দে ভরে গেল। এত মানুষ! তারা সবাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। জাবালে রাহ্‌মাত নামক পাহাড়ে দাঁড়িয়ে তিনি সমবেত মানুষের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) প্রথমেই আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর সমবেত মানুষের দিকে তাকিয়ে বললেন:

তোমরা আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন। আজকের এই দিন তোমাদের কাছে পবিত্র। এ মাসটিও তেমনি তোমাদের কাছে পবিত্র। তোমাদের জীবন ও সম্পত্তি তোমাদের পরস্পরের কাছে পবিত্র।

মনে রেখো, একদিন তোমরা আল্লাহর কাছে হাজির হবে। পৃথিবীতে তোমরা যে কাজ করেছ, আল্লাহ্ তোমাদের কাছে তার হিসাব চাইবেন।

তোমাদের ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীরাও আল্লাহর বান্দা। তাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করো না। তোমরা নিজেরা যা খাবে, তাদেরও তাই খেতে দেবে। নিজেরা যে কাপড় পরবে, তাদেরও তাই পরতে দেবে।

কোনো ক্রীতদাস যদি নিজের যোগ্যতায় আমির হয়, তবে তাকে মেনে চলবে। তখন বংশ-মর্যাদার কথা বলবে না।

মনে রেখো, সব মুসলমান একে অন্যের ভাই। তোমরা এক ভাই কখনও অন্য ভাইয়ের সম্পত্তি জোর করে দখল করো না।

কখনও অন্যায় এবং অবিচার করো না। সামান্য পাপ থেকেও নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবে।

আজ যারা এখানে আসেনি, আমার উপদেশ তাদের কাছে পৌঁছে দিও। হয়ত এই উপদেশ তারা বেশি করে মনে রাখবে।

মানুষ নিজের কাজের জন্য নিজেই দায়ী থাকবে। একজনের অপরাধের জন্য অন্যকে দায়ী করা চলবে না।

মহানবি (স) জোর দিয়ে বললেন :

> ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না। নিজের ধর্ম পালন করবে। যারা অন্য ধর্ম পালন করে, তাদের ওপর তোমরা ধর্ম চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করো না।

মহানবি (স) চারটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে বললেন। এই চারটি কথা হলো :

- আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও উপাসনা করো না।
- অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করো না।
- পরের সম্পদ অপহরণ করো না।
- কারও ওপর অত্যাচার করো না।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) আরও বললেন :

> তোমাদের কাছে আমি দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি।
>
> এক. আল্লাহর বাণী অর্থাৎ কুরআন।
>
> দুই. আল্লাহর প্রেরিত মানব রাসুলের জীবনের আদর্শ। এই দুটি তোমাদের পথ দেখাবে।

মহানবি (স) তাঁর ভাষণ শেষ করলেন। তাঁর চোখমুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "হে আল্লাহ, আমি কি তোমার বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছি?"

আরাফাতের ময়দান থেকে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হলো, "হ্যাঁ, আপনি পেরেছেন।"

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মন তখন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল। পৃথিবীতে তাঁর কাজ শেষ হয়েছে। তাঁর মনে হলো, হয়ত এটাই তাঁর জীবনের শেষ হজ। হয়ত তিনি আর কাবা শরিফে উপস্থিত হতে পারবেন না। সমবেত মানুষের উদ্দেশে তিনি বললেন, "তোমরা সাক্ষী, আমি কর্তব্য পালন করেছি। বিদায়!"

হজ উপলক্ষে আরাফাত ময়দানে নবিজি (স)-এর এটিই ছিল শেষ ভাষণ। আর তাই এটি বিদায় হজের ভাষণ নামে খ্যাত। মানবজাতি চিরদিন তাঁর এই ভাষণকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করবে।

২০২৪
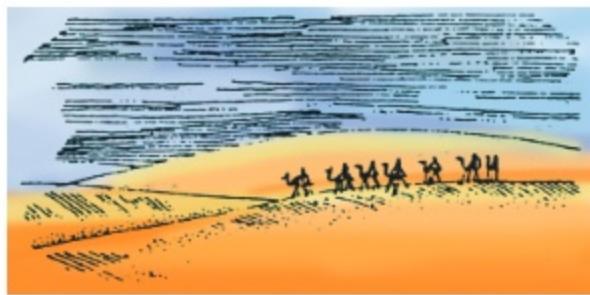
অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

হিজরি হজ মহানবি কাবা শরিফ আরাফাত ভাষণ বান্দা আমির উপাসনা ক্রীতদাস যিলকাদ

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

আরাফাত	ক্রীতদাস	কাবা শরিফ	মহানবি	হিজরি	হজ

ক. দশম .... ছিল মহানবির (স) বিদায় হজ।

খ. তাঁদের ইচ্ছা নবিজি (স)-এর সঙ্গে .... পালন করবেন।

গ. .... হযরত মুহাম্মদ (স) প্রথমেই আল্লাহর প্রশংসা করলেন।

ঘ. যাঁরা তাঁকে কখনও দেখেননি তাঁরাও এই মহামানবকে একবার দেখার জন্য .... এলেন।

ঙ. .... ময়দান থেকে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হলো, 'হ্যাঁ, আপনি পেরেছেন।'

চ. কোনো .... যদি নিজের যোগ্যতায় আমির হয়, তবে তাকে মেনে চলবে।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. হিজরি কোন সালে বিদায় হজ অনুষ্ঠিত হয়?

খ. আরাফাত-ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখে নবিজির (স) মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল?

গ. মহানবি (স) তাঁর ভাষণে ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী সম্পর্কে কী বলেছেন?

ঘ. ধর্ম সম্পর্কে মহানবি (স) কী উপদেশ দিয়েছেন?

ঙ. কোন চারটি কথা নবিজি (স) বিশেষভাবে মনে রাখতে বলেছেন?

চ. তিনি আমাদের কাছে কোন দুটি জিনিস রেখে গেছেন?

৪. ঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দিই।

ক. বিদায় হজ কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

১. মদিনায় ২. মক্কায়

৩. আরাফাতের ময়দানে ৪. জেদ্দায়

খ. বিদায় হজে কত লক্ষ মানুষ অংশগ্রহণ করেন?

১. প্রায় এক লক্ষ ২. প্রায় দুই লক্ষ
৩. প্রায় তিন লক্ষ ৪. প্রায় চার লক্ষ

গ. হযরত মুহাম্মদ (স) কাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করতে নিষেধ করেছেন?

১. সৈন্যদের ২. সাহাবিদের
৩. আলেমদের ৪. ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীদের

ঘ. মহানবি (স) কয়টি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে বললেন?

১. দুটি ২. চারটি
৩. ছয়টি ৪. আটটি

ঙ. মহানবির (স) চোখ-মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল কেন?

১. মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য
২. মক্কা জয়ের আনন্দে
৩. সাহাবিদের নিয়ে হজ পালন করতে পারায়
৪. বিদায় হজের ভাষণে বিপুল সংখ্যক মানুষ দেখে

৫. নিচের বাক্যগুলো এককথায় প্রকাশ করি।

যার তুলনা হয় না — অতুলনীয়
যার শত্রু জন্মায়নি — অজাতশত্রু
আকাশে যে উড়ে বেড়ায় — খেচর
বিদেশে থাকে যে — প্রবাসী
যা কষ্টে লাভ করা যায় — দুর্লভ
যা জলে চরে — জলচর

৬. বিরামচিহ্নগুলো চিনে নিই।

বিরামচিহ্নের নাম	চিহ্নের আকৃতি
কমা	,
সেমিকোলন	;
দাঁড়ি	।
জিজ্ঞাসা-চিহ্ন	?
বিস্ময়-চিহ্ন	!

বাক্যের অর্থ স্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্য বাক্যের মধ্যে বা শেষে আমরা বিরামচিহ্ন ব্যবহার করি। নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্যও এই চিহ্নের জায়গায় আমরা থামি।

এবার নিচের বাক্যগুলো পড়ি এবং ঠিক জায়গায় বিরামচিহ্ন বসাই :

এত বিপুল সংখ্যক মানুষ দেখে নবিজির (স) মন আনন্দে ভরে গেল এত মানুষ এরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছে তাঁর মনে হলো হয়ত এটাই তাঁর জীবনের শেষ হজ।

৭. কর্ম-অনুশীলন।

'বিদায় হজ' রচনাটি থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো লেখো।

জলপরী ও কাঠুরের গল্প

ঈশপ

এক বনে এক কাঠুরিয়া রোজ কাঠ কাটতে যেত। ভারি গরিব সে। কাঠ বিক্রি করে যা রোজগার করত তাই দিয়ে কোনোরকমে খেয়ে-পরে দিন চলত তার। একদিন এক নদীর ধারে সে গেল কাঠ কাটতে। সেখানে গিয়ে একটা গাছে যেই কুড়াল দিয়ে ঘা মেরেছে, অমনি তার হাত ফসকে কুড়ালটা

গভীর পানির মধ্যে পড়ে গেল। খরস্রোতা নদী। তা ছাড়া তাতে কুমিরের ভয় ছিল ভয়ানক। নিরুপায় হয়ে কাঠুরিয়া সেই গাছের গোড়ায় বসে কাঁদতে লাগল।

সে এতই গরিব যে, তার আবার একটা কুড়াল কেনার মতো সামর্থ্য ছিল না। তাই গাছের গোড়ায় বসে সে ভাবতে লাগল। যত ভাবে ততই তার চোখ দিয়ে পানি পড়তে থাকে।

এমনি করে কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর হঠাৎ এক জলপরী নদীর মধ্য থেকে উঠে এলো। সে তাকে প্রশ্ন করল, তুমি কাঁদছ কেন?
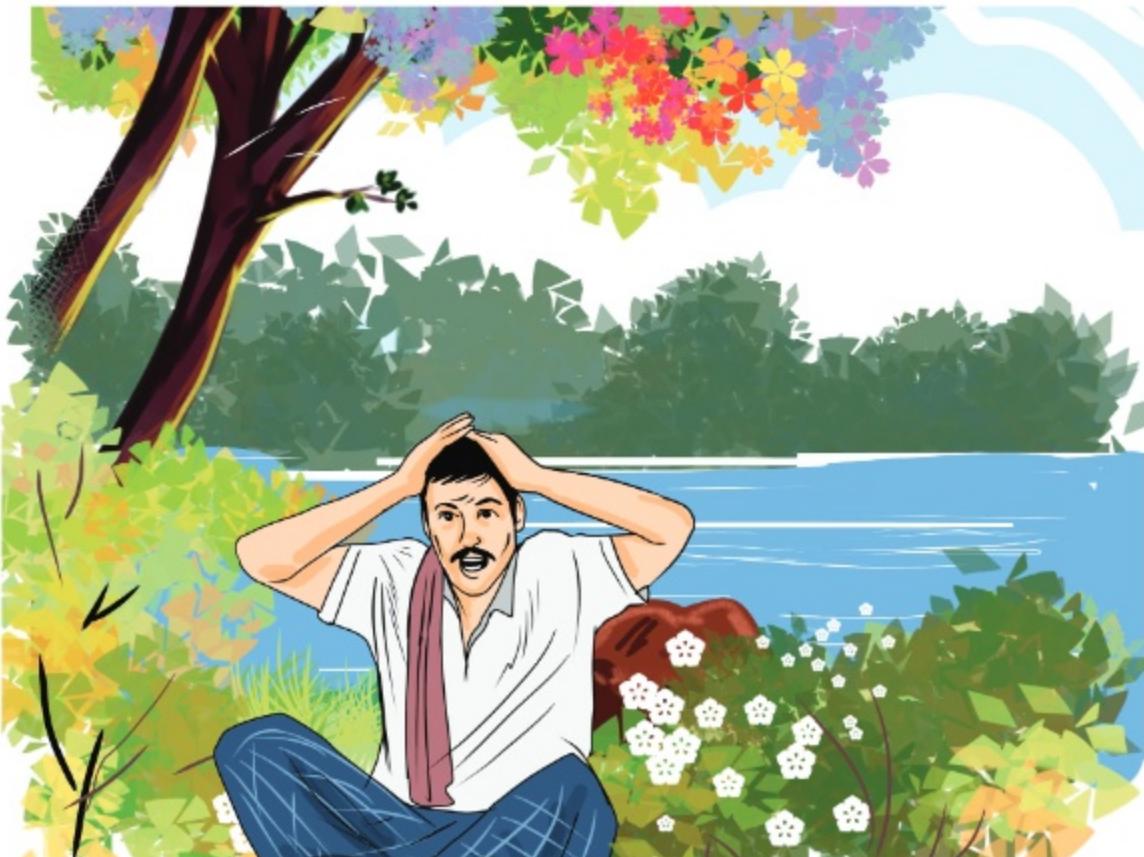
কাঠুরিয়া বলল, আমি বড় গরিব, আমার কুড়ালটা পানিতে পড়ে গেছে, তাই কাঁদছি।

জলপরী বলল, আচ্ছা তোমার কুড়াল আমি এনে দিচ্ছি, তুমি কেঁদো না। এই বলে সে তৎক্ষণাৎ নদীতে ডুব দিয়ে একখানা সোনার কুড়াল তুলে এনে জিজ্ঞাসা করল, এটা কি তোমার?

কাঠুরিয়া ভালো করে দেখে বলল, না।

সঙ্গে সঙ্গে জলপরী আবার পানির মধ্যে ডুব দিয়ে একটা রুপার কুড়াল নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, তবে এটা কি তোমার?

এবারও কাঠুরিয়া বিশেষভাবে পরীক্ষা করে বলল, না, এটাও আমার কুড়াল নয়।

তখন জলপরী আবার ডুব দিয়ে একটা লোহার কুড়াল এনে তাকে দেখাল। কাঠুরিয়া সাথে সাথে নিজের কুড়ালখানি চিনতে পেরে খুশিতে বলে উঠল, হ্যাঁ, এটাই আমার কুড়াল।

জলপরী কাঠুরিয়ার এই সততা দেখে মুগ্ধ হলো। তখন সে তাকে তার নিজের কুড়ালটি তো ফিরিয়ে দিলই, উপরন্তু সোনা ও রুপার কুড়াল দুটিও তাকে উপহার দিল। কাঠুরিয়া খুব খুশি হয়ে যখন পরীকে ধন্যবাদ দিতে যাবে, তখন দেখে সে অদৃশ্য হয়ে পানির মধ্যে হারিয়ে গেছে।

সেই কুড়াল দুটি বাজারে বিক্রি করে কাঠুরিয়া অনেক টাকা পেল। তাতে তার খুব সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটতে লাগল।

এদিকে হলো কি, এই গল্পটি তার মুখ থেকে শোনার পর আর একজন কাঠুরিয়ার মনে বড়ো লোভ জন্মাল। সে একদিন চুপিচুপি সেই নদীর ধারে গাছ কাটতে গিয়ে ইচ্ছে করে তার কুড়ালটা পানির মধ্যে ফেলে দিল। তারপর সেখানে বসে অভিনয় করে কাঁদতে লাগল।

তার কান্না শুনে আবার সেই জলপরী সেখানে উপস্থিত হলো। পূর্বের মতো এবারও প্রথমে একটি সোনার কুড়াল তুলে সে তাকে জিজ্ঞাসা করল, এটা কি তোমার?

সূর্যের আলো পড়ে সোনার কুড়াল ঝলমল করে উঠল। তাই দেখে কাঠুরিয়ার চোখ দুটি লোভে চকচক করে উঠল। সে সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেলল, হ্যাঁ, এটাই আমার। তৎক্ষণাৎ জলপরী টুপ করে সেখানে ডুব দিয়ে কোথায় জানি চলে গেল। আর উঠল না।

লোভী কাঠুরিয়াটি হায় হায় করতে লাগল। সে নিজের কপালে নিজে চড় মারতে মারতে বলল, হায়! কেন মিথ্যা কথা বলতে গেলাম, তাই তো আমার এমন শাস্তি হলো! সোনার ও রুপার কুড়াল পাওয়া দূরে থাক, নিজের যে লোহার কুড়ালটি ছিল তাও হারালাম!

অনুশীলনী

১. জেনে নিই।

সৎ মানুষকে সবাই ভালোবাসে। সততার পুরস্কার পাওয়া যায়। লোভ মানুষকে পতনের দিকে নিয়ে যায়। লোভী মানুষকে কেউ পছন্দ করে না। কথায় বলে—লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

২. নিচের শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই।

কুড়াল – কুঠার, কাঠ কাটার অস্ত্র।
কাঠুরিয়া – কুঠার দিয়ে গাছ বা কাঠ কাটা যার পেশা।
জলপরী – পানিতে বসবাসকারী পাখাযুক্ত কাল্পনিক সুন্দরী নারী।
সামর্থ্য – সংস্থান, সংগতি।

৩. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কাঠুরিয়া কেন কাঁদতে লাগল?
খ. জলপরী কাঠুরিয়াকে কী বলল?
গ. কাঠুরিয়ার সততা দেখে জলপরী কী করল?
ঘ. কীভাবে কাঠুরিয়ার অবস্থার পরিবর্তন হল?
ঙ. লোভী কাঠুরিয়া কী করল?
চ. লোভী কাঠুরিয়া কেন হায় হায় করতে লাগল?

৪. বিপরীত শব্দ লিখি।

গরিব, বিক্রি, কাঁদা, নিজ, সুখ, লোভ, শাস্তি, মুগ্ধ।

৫. সততা সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখি।

লেখক-পরিচিতি

আজ থেকে দুই হাজার দুই শত বছর পূর্বে ঈশপ গ্রিস দেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন সামান্য ক্রীতদাস। তখনকার দিনে রোম ও গ্রিসে ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। ক্রীতদাস হয়েও তিনি যে সাহিত্য রচনা করে গেছেন, তা চিরসুন্দর ও চিরস্থায়ী। তার ভাব যেমন গভীর, ভাষা তেমনি সহজ ও সরল। তাঁর প্রত্যেকটি গল্পের মধ্যে কিছু না কিছু মূল্যবান উপদেশ আছে। তাঁর নীতিমূলক গল্পগুলো বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

নোলক

আল মাহমুদ

আমার মায়ের সোনার নোলক হারিয়ে গেল শেষে
হেথায় খুঁজি হোথায় খুঁজি সারা বাংলাদেশে।
নদীর কাছে গিয়েছিলাম, আছে তোমার কাছে?
– হাত দিও না আমার শরীর ভরা বোয়াল মাছে।
বললো কেঁদে তিতাস নদী হরিণবেড়ের বাঁকে
শাদা পালক বকরা যেথায় পাখ ছড়িয়ে থাকে।
জল ছাড়িয়ে দল হারিয়ে গেলাম বনের দিক
সবুজ বনের হরিৎ টিয়ে করে রে ঝিকমিক
বনের কাছে এই মিনতি, ফিরিয়ে দেবে ভাই,
আমার মায়ের গয়না নিয়ে ঘরকে যেতে চাই।

কোথায় পাবো তোমার মায়ের হারিয়ে যাওয়া ধন
আমরা তো সব পাখপাখালি বনের সাধারণ।
সবুজ চুলে ফুল পিন্দেছি নোলক পরি না তো।
ফুলের গন্ধ চাও যদি নাও, হাত পাতো হাত পাতো–
বলে পাহাড় দেখায় তাহার আহার ভরা বুক।
হাজার হরিণ পাতার ফাঁকে বাঁকিয়ে রাখে মুখ।
এলিয়ে খোঁপা রাত্রি এলেন, ফের বাড়ালাম পা
আমার মায়ের গয়না ছাড়া ঘরকে যাবো না।

[অংশবিশেষ]

অনুশীলনী

১. কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই।

অনন্য সুন্দর বাংলাদেশের প্রকৃতি। মায়ের নোলক হারিয়ে যাওয়ার গল্প বলতে বলতে কবি যেন এই প্রকৃতির সৌন্দর্যকে তুলে ধরেছেন। আমাদের চোখের সামনে ছবির মতো ধরা দিয়েছে এ দেশের নদী, পাখি, ফুল, বন ও পাহাড়। কবি তাঁর মায়ের হারিয়ে যাওয়া নোলক খুঁজে বেড়ান সারা বাংলাদেশে। অন্ধকার রাত নেমে এলেও কবি ঘরে ফিরতে চান না। কিন্তু কেউই বলতে পারে না, কোথায় হারিয়ে গেছে তাঁর মায়ের নোলক। মূলত নোলক খুঁজতে খুঁজতে কবি আমাদের চিনিয়ে দিয়েছেন গ্রাম বাংলার সবুজ ও স্নিগ্ধ প্রকৃতিকে।

২. পাঠ থেকে শব্দগুলো খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

নোলক	হেথায়	হোথায়	যেথায়
হরিৎ	মিনতি	ঘরকে	পাখপাখালি
সাধারণ	পিন্দেছি	আহার	খোঁপা

৩. শূন্যস্থানে শব্দ বসাই।

ক. জল ছাড়িয়ে দল হারিয়ে গেলাম বনের দিক
সবুজ বনের..............টিয়ে করে রে ঝিকমিক।

খ. কোথায় পাবো তোমার মায়ের হারিয়ে যাওয়া ধন
আমরা তো সব পাখপাখালি বনের..............।

৪. বাম পাশের শব্দের সঙ্গে ডান পাশের অর্থগুলো ঠিকভাবে মিলিয়ে পড়ি।

ঘরকে	ওখানে
পিন্দেছি	এখানে
হেথায়	ঘরে
হোথায়	পরেছি

৫. প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনে নিই। উত্তরগুলো লিখি।

ক. নোলক কী? কার নোলক হারিয়ে গেছে?

খ. কবি কোথায় নোলক খুঁজছেন?

গ. কোন নদীর শরীর বোয়াল মাছে ভরা?

ঘ. সবুজ চুলে ফুল পরেছে কে?

ঙ. কবি কেন বাড়ি ফিরবেন না?

৬. পরিচিত পাখি, ফুল ও নদী সম্পর্কে লিখি।

পাখি	
ফুল	
নদী	

কবি-পরিচিতি
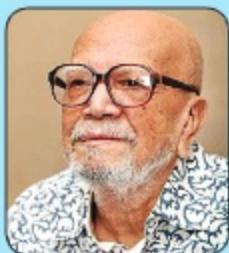
আল মাহমুদ

কবি আল মাহমুদ ১৯৩৬ সালের ১১ই জুলাই বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মোড়াইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা কবি। ছোটোদের জন্য তিনি অনেক বিখ্যাত ছড়া ও কবিতা লিখেছেন। কথাসাহিত্যেও রয়েছে তাঁর অসামান্য অবদান। ছোটোদের জন্য তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'পাখির কাছে, ফুলের কাছে', 'একটি পাখি লেজ ঝোলা'। তিনি ২০১৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

কুমড়ো ও পাখির কথা

[গ্রাম থেকে দূরে বনের ধারে, নির্জন জায়গায় ছিল এক মিষ্টিকুমড়োর লতা। লতায় ছিল একটি মাত্র মিষ্টিকুমড়ো। দেখতে বেশ গোলগাল। ছোট একটি কুল গাছে জড়ানো লতায় মিষ্টিকুমড়োটা ঝুলছিল। সকাল হলো। শিশির জমে আছে ঘাস ও লতাপাতায়।

[মিষ্টিকুমড়ো ও শিশির কথা বলছে।]

শিশির : ও কুমড়ো ভাই, ভালো আছ তো?

কুমড়ো : হ্যাঁ, ভালো। তুমি?

শিশির : আমিও ভালো।

কুমড়ো : তুমি খুব ভালো। রোজ তুমি আমার গা ধুইয়ে দাও। মনে কী যে ফুর্তি লাগে!

শিশির : বৃষ্টি না আসা পর্যন্ত ওটাই আমার কাজ। আমি গাছপালা ঘাস লতাপাতার গা ধুইয়ে দিই। ওরা কেমন সুন্দর হয়ে ওঠে।

(এমন সময় চারদিকে আলো ফুটল, রোদ উঠল।)

রোদ : ও কুমড়ো, তুমি কেমন আছ?

কুমড়ো : তোমার দয়ায় ভালো আছি ভাই। ভোররাতে শিশির গা ধুয়ে দিয়ে গেছে। এখনও গায়ে তোমার আঁচ লাগছে। মনটা খুশিতে ভরে উঠেছে।

শিশির : আমি এখন যাই মিষ্টিকুমড়ো, কেমন? রোদ উঠেছে, এখন আমার যাওয়ার পালা। চলি তা হলে।

কুমড়ো : যাও ভাই, রাতে আবার দেখা হবে।

(এমন সময় দোয়েল পাখি এল। পোকা খেতে খেতে দোয়েল বলে।)

দোয়েল : কী চমৎকার পোকা! তুমি খাবে কুমড়ো ভাই?

কুমড়ো : না ভাই, ওসব আমার খাদ্য নয়, বরং ওরা আমাদের দুশমন। ওদের জ্বালায় একটা ফুলও ফল হতে পারে না। পোকাগুলো সব খেয়ে সাবাড় করে।

দোয়েল : রোজ তোমার লতায় বসি, পাতায় বসি। তুমি রাগ কর না তো আবার?

কুমড়ো : রাগ করব কেন? তুমি আমাদের উপকারী বন্ধু। তুমি পোকা খাও বলেই তো আমরা বেঁচে থাকি। তোমার গান আমার খুব ভালো লাগে।

দোয়েল : তুমি বললে আর কী হবে! মানুষেরা যে আমাদের বাঁচতে দিচ্ছে না।

কুমড়ো : সে কী কথা! মানুষেরাই তো সবার বন্ধু। এই দেখ না, আমাকে একটা পাখি এখানে নিয়ে এসেছে বলে এখানে চারা থেকে গাছ হয়েছি। মানুষের বাড়িতে থাকলে আমাকে মাচা করে দিত।

দোয়েল : তা দিত ঠিক। কিন্তু মানুষ তো বনের গাছপালা কেটে সাফ করছে। মানুষ পাখি আর জীবজন্তুও খায়। ধরে ধরে খাঁচায় ভরে রাখে।

কুমড়ো : তাহলে তো খুব খারাপ বলতে হয়। তবে একদিন মানুষের নিশ্চয়ই সুবুদ্ধি হবে।

দোয়েল : কবে আর হবে! মানুষ মানুষকে মারার জন্য কত রকম অস্ত্র বানাচ্ছে, বোমা মারছে।

কুমড়ো : আজকাল শুনছি মানুষ গাছপালা বাড়াবার কথা বলছে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে অনেকে কথা বলছে। মানুষেরা আমাদের মতো হলে ভালো হতো। দেখ, পাতায় পড়েছে রোদ। শেকড় এনে দিচ্ছে পানি। পাতার মধ্যে আমার রান্নাবান্না হচ্ছে। ওই খেয়ে আমি দিনে দিনে বাড়ছি।

দোয়েল : তোমাদের তো ভারি সুবিধে। আমাদের দেখ সারাদিন ডালে ডালে পোকা খুঁজতে হয়। যাই তাহলে ওই দিকটায় খুঁজে দেখি। পরে আবার আসব।

(এই বলে দোয়েল ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল।)

রোদ : তুমি তো খুব সুন্দর কথা বল। এতক্ষণে ধরে আমি তোমাদের কথা শুনছিলাম। আমার প্রশংসাও করছিলে বেশ।

কুমড়ো : উপকারীর উপকার স্বীকার করাই তো উচিত। তুমি হচ্ছ সবার উপকারী বন্ধু। তোমাকে ছাড়া দুনিয়া অচল।

রোদ : আমিও আসি ওই সূর্য থেকে। সূর্য না থাকলে আমাকে পেতে না। সূর্য না থাকলে পৃথিবী নামের এই গ্রহটাও থাকতো না।

(এমন সময় বাতাস বইল। দোল খেল কুমড়ো। বাতাস কথা বলল।)

বাতাস : শুধু গ্রহ নয়, তাদের উপগ্রহরাও সূর্যের জন্য বেঁচে আছে।

কুমড়ো : চাঁদের আলো আমার খুব ভালো লাগে।

বাতাস : আমাকে তোমার কেমন লাগে? আমি যখন তোমাকে ছুঁয়ে যাই তখন–

কুমড়ো : তোমার জন্যই তো ফুল থেকে ফুলে পরাগ যায়। তাতে ফুল থেকে ফল হয়। ভোমরা আর মৌমাছিও এ কাজে সাহায্য করে। টুনটুনি পাখিও ফুল থেকে ফুলে পরাগ নিয়ে যায়। আমরা এভাবে একে অপরের সাহায্যে বড় হই, বেঁচে থাকি।

(এমন সময় বনের ফিঙে, টিয়ে ও বানরের চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। বাতাসও কিছু না বলে সে দিকে ছুটল। কুমড়ো একা হয়ে গেল। হঠাৎ একটা টুনটুনি উড়ে এসে বলতে লাগল–)

টুনটুনি : মানুষের কথা আর বোলো না। গাছ মানুষকে ফুল, ফল, ছায়া দেয়। অথচ তারা গাছ কেটে উজাড় করে।

কুমড়ো : কী হয়েছে ভাই? গাছ কাটার কথা শুনে আমার খুব ভয় করছে।

টুনটুনি : বনের ভেতর কে যেন চাষ করার জন্য গাছপালা কেটে জমি করেছে। তারপর সেই ডালপালা পোড়ানোর জন্য আগুন দিয়েছে, আর সেই আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সে এক ভীষণ কাণ্ড।

কুমড়ো : তারপর?

টুনটুনি : এখন বৈশাখ মাস। পাতা, ডালপালা সব শুকিয়ে গেছে। কোথা থেকে হাওয়াও এসে জুটেছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে সব কিছু।

কুমড়ো : এখন উপায়। আগুন এখানে আসবে না তো?

টুনটুনি : ওই দেখ– টিয়ে, ফিঙে, দাঁড়কাক, বানর, ভালুক সবাই মিলে ছোটাছুটি চেঁচামেচি করে বন তোলপাড় করে তুলেছে। চেঁচামেচিতে মানুষ ছুটে এসেছে। আগুন নেভাচ্ছে।

কুমড়ো : মানুষই আগুন দিয়েছে, আবার মানুষই ছুটে এসেছে আগুন নেভাতে? আমি বুঝি না মানুষ কেন এমন করে! তা হলে তো অনেক পশুপাখি পুড়ে মরেছে। অনেক জ্যান্ত গাছপালা পুড়ে গেছে। তোমার টোনা কোথায়?

টুনটুনি : আমি সেখানে একটুখানি উঁকি মারতে গিয়েছিলাম। টোনা বলল, এদিকে এসে সকলকে সতর্ক করে দিতে! টোনা দোয়েলের সেবা করছে। দোয়েলের গায়ে নাকি একটু আঁচ লেগেছে।

কুমড়ো : তোমরা ভাই খুব ভালো। একজনের বিপদে আরেকজনকে খবর দাও, খোঁজখবর নিতে পার। আর আমাদের গাছের সঙ্গে ঝুলে থেকে সব করতে হয়।

টুনটুনি : আমি যাই। কাঠবিড়ালি বন্ধুদের খবর নিয়ে আসি।

(এই বলে টুনটুনি ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল। কুমড়ো আবার একা। এদিকে রোদের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে, কুলগাছের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কুমড়ো দিনে দিনে বাড়তে লাগল। বর্ষা এল, চলেও গেল। শরতে মিষ্টিকুমড়ো পেকে মাটিতে ঝরে পড়ল। তারপর একদিন দোয়েলকে দেখা গেল সেই কুল গাছে।)

দোয়েল : ও কুমড়ো ভাই, তুমি কোথায়? তোমাকে দেখছি না কেন?

(মাটিতে কয়েকটি চারা উঠেছে। ওরা মিষ্টিকুমড়োর চারা। ওরা বলল)

চারা : তুমি কে ভাই? কাকে খুঁজছ?

দোয়েল : এখানে একটা মিষ্টিকুমড়ো গাছ ছিল। আর ছিল একটা সুন্দর কুমড়ো।

চারা : ও, আমাদের মায়ের কথা বলছ? আমরা তারই চারা। মাত্র কয়েক দিন হলো আমরা দাঁড়াতে শিখেছি। মা আমাদের সব কথা বলেছে। তোমার কথাও বলেছে।

দোয়েল : কী বলেছে?

চারা : বলেছে তোমাকে মায়ের খবর দিতে। বনের পশুপাখিরা সেই আগুনের হাত থেকে বেঁচে গেছে কি না জানার খুব ইচ্ছা ছিল তার।

দোয়েল : সেই ভয়ানক আগুনের কথা আর মনে করতে চাই না। দুঃখ কষ্টের কথা যত ভুলে থাকা যায় ততই ভালো। তার চেয়ে আমি তোমাদের গান শোনাই। হাওয়ায় হাওয়ায় তোমরা নাচতে শুরু করো, আর আমি গানের সুর তুলি।

[১৯৯৬ সালের পঞ্চম শ্রেণির 'আমার বই' থেকে গৃহীত]

অনুশীলনী

১. শব্দগুলোর অর্থ ও ব্যবহার জেনে নিই।

নির্জন – জনশূন্য, নিরিবিলি। – নির্জন নদীর তীরে রাখাল গান গাইছে।

দুশমন – শত্রু। – পোকা ফসলের দুশমন।

পরাগ – ফুলের রেণু। – মুখে ফুলের পরাগ মেখে লতার দোলনায় দুলব।

২. কথাগুলো বুঝে নিই।

রোদ উঠেছে তো, এখন আমার যাওয়ার পালা – রোদ উঠলে শিশির শুকিয়ে যায়। সে জন্য শিশির এ কথা বলছে।

তুমি আমাদের উপকারী বন্ধু – অনেক পোকা-মাকড় গাছের ক্ষতি করে। দোয়েল পাখি সেসব খেয়ে ফেলে। তাই, কুমড়ো দোয়েলকে উপকারী বন্ধু বলছে।

পাতার মধ্যে আমার রান্নাবান্না হচ্ছে – গাছে রোদ পড়ে, শেকড় মাটি থেকে রস সংগ্রহ করে। এই রোদ ও রস থেকে পাতা গাছের জন্য খাবার তৈরি করে। এজন্যই কুমড়ো বলেছে পাতায় তার রান্নাবান্না হচ্ছে।

ফুল থেকে ফুলে পরাগ যায় – প্রত্যেক ফুলে পরাগ থাকে। এক ফুল থেকে আরেক ফুলে পরাগ গেলে তবেই ফল হয়। বাতাস, মৌমাছি, ভোমরা ও পাখি ফুল থেকে ফুলে পরাগ নিয়ে যায়।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

ক. দোয়েল পাখি কুমড়োর কী উপকার করে?
খ. মানুষের বিরুদ্ধে দোয়েল পাখি কী কী অভিযোগ করেছে?
গ. টুনটুনি কুমড়োকে কী খবর দিল?
ঘ. বনে আগুন লেগে কী ক্ষতি হল? আগুন নেভাতে কারা ছুটে এল?
ঙ. শরৎকালে কুলগাছে ফিরে এসে দোয়েল পাখি কী দেখল?
চ. 'কুমড়ো ও পাখির কথা' থেকে আমরা যা শিখেছি তা পাঁচটি বাক্যে লিখি?

৪. ডান দিক থেকে বিপরীত শব্দগুলো বেছে নিই।

লাভ	অসুবিধে
দুশমন	কুবুদ্ধি
উপকারী	নিন্দা
সুবুদ্ধি	কুৎসিত
সুবিধে	ক্ষতি
প্রশংসা	বন্ধু
সুন্দর	অপকারী

৫. এক কথায় বলি।

যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে – কৃতজ্ঞ।
যে উপকারীর অপকার করে – কৃতঘ্ন।
যে বেশি কথা বলে – বাচাল।
যে হিংসা করে – হিংসুক।

দৈত্য ও জেলে

এক নদীর ধারে বাস করত এক গরিব জেলে। সে প্রতিদিন নদীতে পাঁচ বার করে জাল ফেলত। এতে যে মাছ পেত তা বেচেই তার সংসারের খরচ চালাত। কায়ক্লেশে দিন গুজরান হতো তার। একদিন সকালে জেলে এসে নদীতে জাল ফেলল। প্রথম বার জাল টেনে দেখে একটিও মাছ পড়েনি জালে। জালে উঠল কেবল একটি মোটা গাছের গুঁড়ি। আবার জাল ফেলল সে। দ্বিতীয় বার জাল গুটিয়ে দেখল একটা মরা গাধা জালে জড়িয়ে রয়েছে।

জেলে আবার জাল ফেলল। তৃতীয় বারে জাল গুটিয়ে এনে দেখে বিরাট মাটির জালা। বিষণ্ণ মনে জালাটাকে জাল থেকে বের করে সে নদীর ধারে কাত করে রাখল। চতুর্থ বারে জালে উঠল

একগাদা ভাঙা হাঁড়ি-কলসি, আর ছোটোবড়ো কাচের টুকরো। দুঃখে হতাশায় জেলে এবার আকাশের দিকে মুখ করে বলল, খোদা, তোমার কী মর্জি জানি না। চার চার বার জাল ফেলে নসিবে কিছুই জুটল না। এবারই শেষ। তুমি দয়াময়, দেখ আমার ছেলেমেয়েদের যেন আজ অনাহারে না থাকতে হয়। এই বলে জেলে শেষবারের মতো জালটা পানিতে ছুঁড়ে মারল।

পঞ্চম ও শেষবার সে দেখল, একটা তামার জালা জালে আটকে আছে। জালাটার মুখ ঢাকনা দিয়ে আটকানো। তার উপরে কী যেন সব লেখা খোদাই করা রয়েছে। জেলে সামান্য লেখাপড়া জানত। লেখাটা পড়ে দেখল ওটা দাউদের পুত্র সুলেমানের নাম। জেলের বুকে এবারে কিছুটা আশা ফিরে এল। সে ভাবল, এ যে দেখছি বাদশাহি জালা। নিশ্চয়ই মণিরত্ন কিছু রয়েছে ভেতরে। খোদার দয়ায় এবার বুঝি নসিব ফিরল।

জেলে নদীর পাড়ে পড়ে থাকা একখণ্ড পাথর দিয়ে ঠুকে ঠুকে সাবধানে জালার ঢাকনাটা সরিয়ে ফেলল। ব্যাস, যেই না ঢাকনা সরে গেল অমনি গলগল করে রাশি রাশি ধোঁয়া বেরিয়ে আসতে লাগল ভেতর থেকে। জেলে চোখ বড়ো বড়ো করে ভয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল। দেখতে দেখতে সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলি একটা অতিকায় দৈত্যে পরিণত হলো।

দৈত্যের মাথাটা একটা বিশাল ঝুড়ির মতো। একগাছিও চুল নেই সেই মাথায়। আগুনের গোলার মতো ভয়ংকর দুটি চোখ আর মুখে শ্বেত পাথরের টুকরোর মতো দাঁত। দৈত্য বলল, সুলেমান ছাড়া আমি দুনিয়ার কাউকে পরোয়া করি না। কারণ আল্লাহর পয়গম্বর স্বয়ং সুলেমান।

একটু থেমে দৈত্য হাত জোড় করে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিনীতভাবে বলল—মেহেরবান সুলেমান, দোহাই তোমার, আমাকে মেরে ফেলো না। আমি এক মুহূর্তের জন্যও আর তোমার কথার অবাধ্য হব না। যা হুকুম করবে, নত শিরে তাই তামিল করব।

জেলে দৈত্যের কথা শুনে ততক্ষণে কিছুটা সামলে নিয়েছে নিজেকে। সাহস করে বলল, হে দৈত্য, বাদশা সুলেমানের ভয়ে তুমি অমন কুঁকড়ে যাচ্ছ, সুলেমান তো আঠার শ বছর আগে এ দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে বেহেশতে চলে গেছেন। তুমি কী এমন অন্যায় কাজ করেছিলে যার জন্য সুলেমান তোমাকে জালাটার মধ্যে পুরে রেখেছিলেন?

জেলের কথা শুনে দৈত্য হা-হা করে এমন জোরে হেসে উঠল যে, শব্দে জেলের কানে তালা লেগে যাবার অবস্থা হলো। হাসি থামিয়ে দৈত্য বলল, আল্লাহ ছাড়া আর কারো ওপরেই আমার সামান্যও আস্থা নেই। তাঁর কাছ থেকে তোমার জন্য জব্বর একটা খবর নিয়ে এসেছি।

জেলে সাহস করে জিজ্ঞেস করল, কী সে জব্বর খবর? তুমি দয়া করে আমাকে বল।

দৈত্য হাসতে হাসতে বলল, মৃত্যু। তোমার খবর। আর সেই মৃত্যু হবে এক ভয়ংকর উপায়ে।

মৃত্যুর কথা শুনে ভয়ে জেলের মুখ শুকিয়ে গেল। সে কাঁপতে কাঁপতে কোনো রকমে বলল, ভাই দৈত্য, আমি তো কোনো অন্যায় কাজ করিনি। তাহলে তুমি কেন আমাকে মারতে চাইছ? কতকাল তুমি এই জালাটার মধ্যে বন্দি হয়ে ছিলে। নড়াচড়া করতে না পেরে কতই না কষ্ট পাচ্ছিলে। আমি তোমাকে মুক্তি দিয়েছি। এটাই যদি আমার অন্যায় হয়ে থাকে, আর তার জন্যই যদি আমাকে জান দিতে হয়, তবে আমার আর কিছুই বলার নেই ।

দৈত্য যেন জেলের কথা শুনতেই পেল না। বলল, বল, তুমি নিজেই বল, কীভাবে মরতে চাও?

জেলে এবারে হাতজোড় করে বলল, মরতে আমার ভয় নেই, কিন্তু আমার অন্যায়টা কী তা বলবে তো? কেন তুমি আমাকে মারতে চাইছ?

দৈত্য এবারে বলল, তোমার গোস্তাকি কী, শুনবে? বদনসিব জেলে, তা হলে শোন বলছি। আমার নাম সক-হর-অল জিন। আমি বাদশাহ সুলেমানের গোলাম ছিলাম। আমার এমনই ক্ষমতা ছিল যে, দুনিয়ায় কাউকেই পরোয়া করতাম না। একদিন বাদশাহর হুকুম তামিল করতে অস্বীকার করে বসলাম। এতে রেগে দিয়ে বাদশাহ শায়েস্তা করবার জন্য তার লোকজন দিয়ে আমাকে একটা তামার জালায় পুরে তার মুখ বন্ধ করে দিল। তারপর বাদশাহর মোহর খোদাই করে দিল জালাটার মুখে। আমি জালার ভেতরে বন্দি হয়ে গেলাম। বাদশাহ এরপর জালাটাকে নদীতে ফেলে দিল। নদীর তলায় বন্দি অবস্থায় কাটতে লাগল আমার দিন। একদিন শপথ করলাম যদি চারশ বছরের মধ্যে কেউ আমাকে এ বন্দিদশা থেকে মুক্তি দেয়, তবে তাকে আমি অগাধ ধনরত্ন দিয়ে খুশি করব। কিন্তু আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে, কেউ আমাকে মুক্তি দিল না ।

নদীর তলায় এক এক করে চারশ বছর বহু কষ্টে কাটল আমার। তারপর আমি আবারও শপথ করলাম, যে আমাকে এই জালা থেকে উদ্ধার করবে, তাকে তিনটি বর দেব। যা সে চাইবে তা-ই পাবে। কিন্তু শয়ে শয়ে তিনশ বছর পার হল, কারো দেখা পেলাম না। এবারে আমার মেজাজ বিগড়ে গেল। রাগে দুঃখে অপমানে শপথ করে বসলাম, আমাকে যে মুক্ত করবে সেই হতচ্ছাড়াকে আমি কতল করব। শতাব্দীর পর শতাব্দী গেল, কেউ উদ্ধার করতে এলো না। এভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল। কত বছর কাটল তার আর হিসেব রাখতে পারলাম না। ভাগ্যের ফলে এবারে তুমি এসে হাজির হলে। আমাকে মুক্তি দিলে। কিন্তু তুমি ডেকে আনলে নিজের মৃত্যু। শেষবারের মতো সুযোগ দিচ্ছি, তুমি নিজেই বেছে নাও কীভাবে মরতে চাও।

দৈত্যের কাহিনি শুনে জেলে বুঝতে পারল, আজ আর তার রক্ষা নেই।

মৃত্যুর ভয়ে ভীত হলেও জেলে বুদ্ধি হারাল না। হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে বলল, ভাই, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না যে, তোমার অত বড় শরীরটা কেমন করে এই জালার মধ্যে ছিল। সত্য বলছ কি মিথ্যা বলছ, তা তুমিই জান। কিন্তু আমি হলপ করে বলতে পারি তোমাকে দেখলে এ কথা কেউই বিশ্বাস করবে না।

জেলের কথা শুনে দৈত্য দাঁত কড়মড় করে মেঘের গর্জন তুলে বলল, কী! আমি মিথ্যা কথা বলছি? এই জালার মধ্যে আমি থাকতে পারি না? বেশ, মরার আগে জেনে যাও, দৈত্য মিথ্যা কথা বলে না।

কথাগুলো বলে অহংকারী দৈত্য চোখের পলকে ধোঁয়ার কুণ্ডলি পাকিয়ে জালাটার ভেতরে ঢুকে গেল। আর যেই না ভেতরে ঢোকা, অমনি জেলে এক লাফে এসে জালাটার মুখে ঢাকনা লাগিয়ে দিল।

তারপর হাসতে হাসতে চিৎকার করে বলল, বেইমান দৈত্য, এবার নিজেকে রক্ষা কর। তোর প্রতিজ্ঞা নিয়ে আবার শতাব্দীর পর শতাব্দী জলে ডুবে থাক। দেখব, এবারে কে তোকে রক্ষা করে। এই বলে জেলে জালাটাকে আবার নদীতে ফেলে দিল।

[আরব্য উপন্যাস 'আলিফ লায়লা' থেকে সংকলিত]

অনুশীলনী

১. জেনে নিই।

কল্পকাহিনি 'আলিফ লায়লা' আরবীয় গল্প হলেও কাহিনিগুলোর আবেদন সর্বজনীন। ১০০১টি কাহিনিভিত্তিক আরব্যরজনীর গল্প লোকের মুখে মুখে ফিরত। এগুলোর অধিকাংশই সংগৃহীত হয়েছে বাগদাদের খলিফা হারুন অর রশীদের আমলে। এই লোককথাগুলো এক হাতে, একসময়ে, এমনকি এক দেশে লেখা হয়নি। প্রাচীন পারসিক ভাষায় হাজার আফসানা বা হাজার গল্প নামে এই গল্পগুলো প্রথম লিখিত রূপ পেয়েছিল। মোঘল আমলে এ কাহিনিগুলো মধ্যপ্রাচ্য থেকে এ দেশে এসেছে। গল্পগুলো এখন বিশ্বসাহিত্য জগতের সম্পদ।

২. নিচের শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই, বাক্য লিখি

জেলে — মৎস্য শিকারী। — জেলেরা মাছ বেচে সংসার চালায়।
কায়ক্লেশে — শারীরিক পরিশ্রম করে। — শ্রমিকরা কায়ক্লেশে জীবনযাপন করে।
গুজরান — অতিবাহিত করা, যাপন। — সে খুব কষ্টে দিন গুজরান করে।
মর্জি — ইচ্ছা, সম্মতি। — মর্জি হলে এখন তুমি গান গাইতে পার।
জালা — বিরাট মাটির পাত্র বিশেষ। — জালার মধ্যে দৈত্যটি বন্দি ছিল।
অনাহার — উপবাস, না খেয়ে থাকা। — গরিব লোকটি কোনো কোনো দিন অনাহারে কাটায়।
গোস্তাকি — অপরাধ, অনিয়ম। — শিক্ষক বললেন, 'তুমি গোস্তাকি করেছ, মাফ চাও'।
নসিব — ভাগ্য, অদৃষ্ট। — আমার নসিব ভালো।
বদনসিব — মন্দ ভাগ্য। — বদনসিব ছেলেটির পরীক্ষার আগের রাতে জ্বর হলো।
শ্বেত — সাদা, ধবল। —তাজমহল শ্বেত পাথর দ্বারা নির্মিত।
আস্থা — ভরসা, বিশ্বাস। — রহিমের ওপর সকলের আস্থা আছে।
জব্বর — দারুণ। — তোমাকে একটি জব্বর খবর দেব।
বেইমান — অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক। — সবাই বেইমানকে ঘৃণা করে।
প্রতিজ্ঞা — শপথ, অঙ্গীকার। — সবার উপকার করব—এ আমার প্রতিজ্ঞা।
মোহর — স্বর্ণমুদ্রা, এখানে সিল বা নামের ছাপ। — পরীক্ষার উত্তরপত্রগুলো মোহর করে দাও।

৩. শূন্যস্থান পূরণ করি।

ক. সে প্রতিদিন নদীতে .... করে জাল ফেলত।

খ. বলতে বলতে জেলে .... বারের মতো জালটা .... ছুঁড়ে মারল।

গ. তোমার জন্য .... একটা খবর নিয়ে এসেছি।

ঘ. কেন তুমি আমাকে .... চাইছ?

ঙ. দৈত্য এবার বলল, তোমার .... কী শুনবে?

৪. ডান দিক থেকে শব্দ বেছে নিয়ে বাম দিকের শব্দের সঙ্গে মেলাই।

গরিব	–	জেলে
মাটির	–	দাঁত
কাচের	–	খবর
কুণ্ডলি	–	লোকজন
জব্বর	–	বিগড়ে
বাদশাহর	–	জালা
কড়মড়	–	পাকিয়ে
মেজাজ	–	টুকরো

৫. নিচের শব্দগুলোর উচ্চারণ ও বানান জেনে নিই।

কায়ক্লেশে, কসরত, ব্যর্থ, বিষণ্ন, দীর্ঘশ্বাস, বিস্ফারিত, কুণ্ডলি, ভয়ংকর, আস্থা, আতঙ্ক, বিদ্রোহী, বিশৃঙ্খল।

৬. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. জেলের সংসার কীভাবে চলত?

খ. জালা দেখে জেলে কী ভাবল?

গ. জালা থেকে কী বের হয়ে আসল?

ঘ. দৈত্যটি দেখতে কেমন ছিল?

ঙ. বাদশাহ কেন দৈত্যকে বন্দি করেছিলেন?

চ. দৈত্য কেন জেলেকে মারতে চেয়েছিল?

ছ. জেলে কেমন করে দৈত্যের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করল?

৭. গল্পটি পড়ে কী শিখলাম, তা লিখি।

শব্দের অর্থ জেনে নিই

শব্দ	অর্থ
অ	
অচিনপুর	– অচেনা স্থান।
অবধারিত	– অনিবার্য, যা হবেই, নির্ধারিত ।
অবরুদ্ধ	– শত্রু দিয়ে বেষ্টিত, বন্দি।
অহংকার	– নিজে অনেক বড় কেউ – এরকম মনে করা।
অপার	– অগাধ, অসীম।
অভ্যুত্থান	– গণআন্দোলন, বিদ্রোহ।
অভিভূত	– ভাবাবিষ্ট বা আচ্ছন্ন হয়ে পড়া।
অমূল্য	– যার মূল্য নির্ধারণ করা যায় না।
আ	
আক্রমণ	– অন্যের ওপর হামলা।
আসন্ন	– নিকট।
আচ্ছাদন	– ঢাকনি, ছাউনি।
আত্মদানকারী	– নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন যিনি।
আনকোরা	– নতুন।
আস্তানা	– বসবাসের জায়গা।
আষ্টেপৃষ্ঠে	– সর্বাঙ্গে, সারা শরীরে।
আরাফাত	– মক্কা থেকে প্রায় বারো মাইল পূর্বে অবস্থিত প্রসিদ্ধ ময়দান।
আমির	– বড়লোক; ধনী; সম্পদশালী সম্ভ্রান্ত মুসলমান; মুসলমান শাসকের উপাধি।
আহার	– ভোজন, খাদ্যগ্রহণ।
আন্দোলন	– কোনো লক্ষ অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রচার; সংঘবদ্ধ বিক্ষোভ।
ই	
ইঙ্গিত	– ইশারা।
উ	
উপত্যকা	– দুই পাহাড় বা পর্বতের মাঝখানের সমতল ভূমি বা নিচু ভূমি অথবা পাহাড়-পর্বতের পাশের ভূমি।
উপাসনা	– এবাদত; আরাধনা; আল্লাহর ধ্যান।
ঊ	
ঊর্মি	– নদী ও সাগরের ঢেউ।
ঊর্মিমালা	– ঢেউসমূহ, ঢেউগুলো।
এ	
এফএ	– (Final Arts) আজকের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার সমতুল্য।
এক্সপেরিমেন্ট	– পরীক্ষা-নিরীক্ষা।
ঐ	
ঐতিহাসিক	– যাঁরা ইতিহাস লেখেন বা ভালো জানেন। ইতিহাসে স্থান লাভের যোগ্য বা ইতিহাস-ভিত্তিক হলেও তাকে ঐতিহাসিক বলা হয়।
ক	
কল্পকাহিনি	– যে কাহিনি কল্পনা করে লেখা হয়। এক প্রকার কল্পকাহিনি আছে যা বিজ্ঞানকে প্রধান করে লেখা হয়, তাকে বলা হয় বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি।
কাবা শরিফ	– মক্কায় অবস্থিত আল্লাহর ঘর, যা মুসলমানদের কিবলা।
কড়ি	– এক ধরনের ছোট্ট সাদা ঝিনুক।
কিচির মিচির	– পাখির ডাকাডাকির আওয়াজ।
কিরণ	– আলো।

ক্রীতদাস – কেনা গোলাম। মূল্য দিয়ে যে ভৃত্যকে যাবজ্জীবনের জন্য কেনা হয়।

কুমার – রাজার ছেলে (রাজকুমার); মাটির পাত্র বা পুতুল তৈরি যার পেশা।

কুর্নিশ – মাথা নত করে অভিবাদন করা।

কাঁকন – হাতে পরার গহনা।

কেল্লা – দুর্গ, সুরক্ষিত আশ্রয়।

কোলাহলকল – কোলাহল হলো অনেক মানুষের শোরগোল, গোলমাল। আর 'কল' বলতে বোঝায় মানুষের গলার সুন্দর আওয়াজ। এখানে খেলায় সকলে এক সঙ্গে গোল-গোল চিৎকার করলে বেশ ভালো শোনায় বলে 'কোলাহলকল' বলা হয়েছে।

ক্যাম্প – সৈনিক বা যোদ্ধাদের অস্থায়ী ঘাঁটি। সেনাছাউনি।

ক্যান্টনমেন্ট – সেনানিবাস।

খ

খাজনা – কর বা ট্যাক্স।

খাটিয়া – কাঠের তৈরি খাট।

খ্রিস্টপূর্ব – যিশুখ্রিস্টের জন্মের পূর্বের বৎসর বোঝাতে বলা হয় খ্রিস্টপূর্ব, আর তাঁর জন্মের পরের বছরগুলোকে বলা হয় খ্রিস্টাব্দ।

খোঁপা – মাথার পেছনে গোছা করে বাঁধা চুল।

ক্ষ

ক্ষত – শরীরের কাটা স্থান বা আঘাত পাওয়া স্থান।

গ

গর্জে ওঠা – হুংকার দিয়ে ওঠা।

গর্দান – ঘাড়, গলা।

গিরিডি – ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যে অবস্থিত। এটি গিরিডিহ্ জেলার একটি প্রধান শহর। ১৮৭২ সালের আগে স্থানটি হাজারিবাগ জেলার মধ্যে ছিল।

গেরস্ত – গৃহস্থ, সংসারী লোক। গেরস্ত লোকের বহু কাজকর্ম থাকে।

ঘ

ঘোর – অত্যন্ত, অনেক বেশি, গভীর।

চ

চকাচকি – হাঁসজাতীয় পাখি।

চন্দ্রলোক – চাঁদের দেশ।

চরণ – পা।

চিনচিন – অল্প অল্প ব্যথা বা জ্বালা বোঝায় এমন শব্দ।

জ

জগৎ – পৃথিবী।

জনপদ – যেখানে অনেক মানুষ এক সাথে বসবাস করে, লোকালয়, শহর।

ট

টনটন – যন্ত্রণা বোঝায় এমন অনুভূতি।

টহল – পাহারা দেওয়া।

টেপা পুতুল – কুমাররা নরম এঁটেল মাটির চাক হাতে নিয়ে টিপে টিপে নানা ধরনের ও নানা আকারের পুতুল তৈরি করেন। টিপে টিপে তৈরি করা হয় বলে এসব পুতুলের নাম টেপা পুতুল। তবে এসব মাটির পুতুলের হাত-পা বা জোড়াগুলো একটু ভিজে ভিজে মাটি দিয়ে যত্ন করে লাগাতে হয়।

টেরাকোটা – 'টেরা' অর্থ মাটি, আর 'কোটা' অর্থ পোড়ানো। পোড়ামাটির তৈরি মানুষের ব্যবহারের সব রকমের জিনিস টেরাকোটা হিসেবে পরিচিত।

টুকটুক – গাঢ়, সুন্দর।

ড

ডিঙি – একধরনের নৌকা।
ড্রিবলিং – এটা ফুটবল খেলার একটা কৌশল। ইংরেজি dribble শব্দের অর্থ হলো পায়ে-পায়ে বল গড়িয়ে নিয়ে কৌশলে বল কাটিয়ে নিয়ে যাওয়া।

ত

তট – নদীর তীর।
তটস্থ – ব্যতিব্যস্ত।
তারারা – আকাশের তারকারাজি।
তিরিক্ষি – খারাপ মেজাজ।
তুলকালাম কান্ড – এলাহি কান্ড।
তেষ্টা – তৃষ্ণা, পিপাসা। তেষ্টায় যেন ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

দ

দিগন্ত – প্রান্তরের শেষে আকাশ যেখানে গিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে বলে মনে হয়।
দ্রুতগতিতে – খুব তাড়াতাড়ি করে, জোরে যাওয়া।
দেশান্তর – অন্য দেশ।
দোলাই মাথা – মাথা নাড়াই।

ধ

ধরা – পৃথিবী।

ন

নকশা – রেখা দিয়ে আঁকা ছবি। শখের হাঁড়ি, টেপা পুতুল বা পশুপাখির গায়ে গ্রামের কুমার শিল্পীরা নানা রঙের ছবি আঁকেন। এ ছবিগুলোই হলো নকশা।
নিশিরাত – গভীর রাত্রি। মাঝ রাত।
নির্জন – জনশূন্য স্থান।
নিদর্শন – প্রমাণ, চিহ্ন বা উদাহরণ।
নির্বিচারে – কোনো রকম বিচার বিবেচনা ছাড়া।
নোলক – নাকে পরার ঝুলন্ত অলংকার বিশেষ।

প

পরস্পর – একের সঙ্গে অন্যের।
পরাধীন – পরের অধীন, স্বাধীন নয়।
পন্থা – পথ।
পট্টি – কাপড়ের লম্বা টুকরা। এটা দিয়ে শরীরের কোনো স্থান বাঁধা থাকে।
পর্যবেক্ষণ – কোনো কিছু বা প্রাকৃতিক ঘটনা খেয়াল করে দেখা।
পাখপাখালি – নানা ধরনের পাখি।
পাষণ্ড – নির্দয়।
পাণ্ডিত্যপূর্ণ – জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ।
পিন্দা – পরা, পরিধান করা।
পুঁটলি – বোঁচকা।
প্রকৃতি – নিসর্গ।
প্রাচীনতম – প্রাচীন হলো পুরাতন বা বহুকাল আগের কিছু। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হলে তম যোগ করা হয়।
প্রান্তর – মাঠ, জনবসতি নেই এমন বিস্তীর্ণ ভূমি।
প্রতিবাদী – যে কোনো উক্তির বিরুদ্ধে যারা আপত্তি জানায়।
প্রতিধ্বনি – বাতাসে ধাক্কায় ধ্বনির পুনরায় ফিরে আসাকে প্রতিধ্বনি বলে।
প্রবাসী – ভিন্নদেশে যে বাস করে।
প্রবাহিত হওয়া – বয়ে চলা, গড়িয়ে গড়িয়ে চলা।

প্রবেশিকা/প্রবেশিকা পরীক্ষা – আজকের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা। প্রবেশিকা পাস করলে কলেজে প্রবেশ করা যেত। তাই নাম হয়েছিল প্রবেশিকা।

প্রপাত – উচ্চস্থান থেকে নিম্নস্থানে বেগে পতন ।

প্রক্ষালন – ধোওয়া, পানি দিয়ে পরিষ্কার করা।

ফ

ফরমায়েস – হুকুম, আদেশ।

ফুরসত – অবসর, অবকাশ, ছুটি।

ফেরিঅলা – রাস্তায় বা বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে যারা জিনিসপত্র বিক্রি করেন।

ফেড়ে – ছিঁড়ে।

ফোটে – প্রস্ফুটিত হয়, ফুটে ওঠে।

ব

বরণ – সাদরে গ্রহণ।

বরকন্দাজ – বন্দুকধারী সিপাই বা রক্ষী।

বজ্র – ভীষণ শব্দ করে ঝড়ের আকাশে বিদ্যুৎ প্রকাশ পাওয়া, বাজ।

বদ্ধ – বন্ধ।

বর্গি – মারাঠা দস্যু।

বরেণ্য – মান্য।

বাহার – সৌন্দর্য।

বারি – পানি । (শব্দটি শুধু কবিতায় ব্যবহৃত হয় ।)

বান্দা – গোলাম, দাস, একান্ত বাধ্য।

বিজু – চাকমাদের নববর্ষ উৎসব।

বিজয়স্তম্ভ – কোনো কিছু জয় করার পর যে স্তম্ভ নির্মাণ করে বিজয় ঘোষণা করা হয়।

বিলুপ্ত – যা লোপ পেয়েছে।

বিস্বাদ – খেতে মজা নয় এমন।

বেলাভূমি – সমুদ্রের তীরে বালুময় স্থান।

বেণুবন – বাঁশবাগান।

বৈচিত্র্য – বিভিন্নতা।

ভ

ভয়ঙ্কর – ভীষণ, ভীতিজনক, অত্যন্ত।

ভাষণ – বক্তৃতা, বিবৃতি, উক্তি।

ম

মহানবি – আল্লাহর পয়গম্বর; রাসুল; প্রেরিত পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যিনি। শেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (স)-কে মহানবি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

মহান – শ্রেষ্ঠ, মহৎ, উদার।

মনস্বী – উদারমনা।

মহাকলরব – কলরব শব্দের অর্থ অনেক মানুষের গলায় এক সাথে চেঁচামেচি, আওয়াজ। মহাকলরব অর্থ–ভীষণ চিৎকার, চেঁচামেচি।

মরণ–যন্ত্রণা – মৃত্যুর কষ্ট।

মায়াবতী – দয়া, মমতা আছে যে নারীর।

মালিশ – যে ওষুধ বা মলম চেপে–চেপে শরীরে লাগাতে হয়।

মিনতি – প্রার্থনা, অনুরোধ।
মুগ্ধ – বিমোহিত, আনন্দিত।
মেদিনী – ভূপৃষ্ঠ, পৃথিবী।
মৃৎশিল্প – মাটির তৈরি শিল্পকর্মকে আমরা বলি মাটির শিল্প বা মৃৎশিল্প। আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প হচ্ছে মৃৎশিল্প।

য

যশস্বী – বিখ্যাত, কীর্তিমান।
যিলকাদ – আরবি বছরের একটি মাসের নাম।
যুগান্তর – অন্যযুগ বা সময়।
যেথায় – যে স্থানে, যেখানে।

র

রয়েল – রাজকীয়।
রক্তরঞ্জিত – রক্ত দিয়ে লাল করা হয়েছে যা।
রক্ষী – প্রহরী, সেনা।
রাজপ্রাসাদ – রাজার বাসভবন বা রাজবাড়ি।
রুক্ষমূর্তি – উগ্ররূপ।

ল

লবেজান – হয়রান।

শ

শখ – মনের ইচ্ছা, রুচি।
শখের হাঁড়ি – রং দিয়ে নকশা আঁকা এক ধরনের মাটির পাত্র। শখ করে পছন্দের জিনিস এই সুন্দর হাঁড়িতে রাখা হয়।
শক্তিধর – শক্তি আছে যার।
শঙ্কিত – ভীত।
শব্দদূষণ – অত্যন্ত কোলাহলে শব্দদূষণ ঘটে।
শাহানশাহ – বাদশাহ, রাজাধিরাজ।
শাহজাদা – বাদশার পুত্র।
শায়িত – শুয়ে আছে এমন।
শির – মাথা।
শিল্পী – যিনি কোনো শিল্পকলার চর্চা করেন তিনিই শিল্পী। যেমন– সঙ্গীতশিল্পী, চিত্রশিল্পী।

স

সংকল্প – প্রতিজ্ঞা।
সরকার – দেশ চালায় যে।
সমস্বরে – একসঙ্গে শব্দ করা বা কথা বলা।
সার্থক – সফল।
সাংগ্রাই – রাখাইনদের নববর্ষ উৎসব।
সিন্ধু – সাগর।
সের – পুরানো পদ্ধতির ওজন মাপার একক (১ সের= প্রায় ০.৯৩৫ কেজি)।
স্নেহ-কণা – আদর

স্বাদ – খেতে ভালো লাগে এমন।
স্বজন – নিজের লোক, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব।
স্বর্ণলতা – সোনালি রঙের বুনো লতা। অনেক সময় পথের ধারের গাছগাছালি ভরে থাকে। এই লতা আপনা-আপনি জন্মায়।
সৌভাগ্য – ভালো ভাগ্য।
সম্ভার – বিভিন্ন উপাদান, বিভিন্ন জিনিস।
স্রোতস্বিনী – নদী।

হ

হরিৎ – সবুজ বর্ণ।
হুংকার – চিৎকার।
হজ – হিজরি জিলহজ মাসের ৯ তারিখে নির্দিষ্ট স্থানে ইহরাম বেঁধে মক্কার অদূরবর্তী আরাফাত ময়দানে অবস্থান ও পরে কাবার তওয়াফ সংবলিত ইসলামি অনুষ্ঠান।
হিজরি – হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় গমন (৬২২ খ্রীষ্টাব্দ) অর্থাৎ হিজরতের দিন থেকে গণনাকৃত চান্দ্র অব্দ বা বছর।
হেথায় – এখানে।

সমাপ্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত থাকবে।

পতাকা নির্মাণের নিয়মাবলি
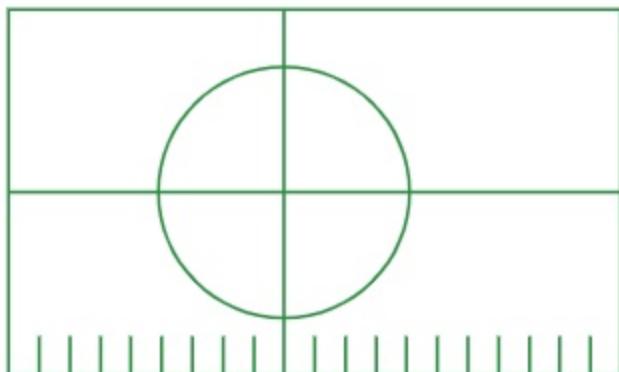
দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০ : ৬। অর্থাৎ যদি দৈর্ঘ্য ৩০৫ সেমি (১০ ফুট) হয়, প্রস্থ ১৮৩ সেমি (৬ ফুট) হবে। লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। পতাকার দৈর্ঘ্যের ২০ ভাগের ৯ ভাগে একটি লম্ব (খাড়া সরলরেখা) টানতে হবে। তারপর প্রস্থের ঠিক অর্ধেক ভাগে দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সমান্তরাল করে আর একটি রেখা টানতে হবে। এই দুটি রেখার ছেদবিন্দুই হবে বৃত্তটির কেন্দ্রবিন্দু।

ভবনে ব্যবহারের জন্য

(ভবনের আকার ও আয়তন অনুযায়ী)

৩০৫ সেমি x ১৮৩ সেমি (১০' x ৬')

১৫২ সেমি x ৯১ সেমি (৫' x ৩')

৭৬ সেমি x ৪৬ সেমি (২$\frac{১}{২}$' x ১$\frac{১}{২}$')

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে—
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণপাঠ

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে
ও মা, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি,
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে—
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন
ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য, ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণি–বাংলা

পরনিন্দা ভালো নয়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য